বুলেটিন নং: ১৪
বর্ষ ৬ ॥ সংখ্যা ২
প্রকাশ কাল: ১২ এপ্রিল ২০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৳ ৫ ॥ $2

THE SWADHIKAR
স্বাধিকার

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) -এর মুখপত্র

**স্বাধিকার কিনুন
স্বাধিকার পড়ুন
আন্দোলনে সামিল হোন**

ঈশ্বর তাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে দিন, তারা জানে না যে শয়তানের খপ্পড়ে পড়েছে

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্ভাগা জনগণ কি কেবল মার খেয়ে থাকবে? শোষণ, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, প্রতারণার কি কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না? অন্যায় অরাজকতাকে নত শিরে মেনে নেয়াই কি তাদের নিয়তির একমাত্র বিধিলিপি? 'শয়তানের' খেয়াল-খুশীর শিকার হয়ে থাকতে হবে চিরকাল তাদের? ভাগ্যের কি কোন পরিবর্তন হবে না? কি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে? এক বছর নয়। দু'বছর নয়। বিশ-বাইশটা বছর দুর্ভাগা জনতা অধীর প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছে। 'আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার' পাবে। জনসংহতি সমিতি-শান্তিবাহিনী জনগণের জন্য আন্দোলন করছে। তাই কোন প্রশ্ন নয়। তাদের কথামতো চলতে হবে। যার যা আছে তাই দিয়ে জনতা খাইয়ে -পরিয়ে- আশ্রয় দিয়ে- তথ্য দিয়ে আন্দোলনে সহায়তা করলো। আন্দোলনের প্রথম দিকে ভুল হয়, হয়ে থাকে। তাই মুক্তিকামী জনতা অনেক ভুল-ভ্রান্তি বড় করে দেখলো না। নীরব করে থাকলো। মুখ বুঁজে সহ্য করলো বহু অনয়িম অনাচার। তবু অন্তরে লালিত শত বছরের স্বপ্ন 'অধিকার' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য যত মূল্য দিতে হয়, হোক। অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠির চোখ রাঙানী,জোর-জুলুম, অন্যায়- অত্যাচার, জ্বালাও পোড়াও চলে, চলুক। জনতা দমে যেতে প্রস্তুত ছিলো না, এখনো যেতে চায় না। একদিন ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে। সুদিন আসবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের লাঞ্ছিত জনতা প্রকৃত মানুষের মতো মর্যাদা পাবে। স্বাধীন মুক্ত পরিবেশে হেসে খেলে বেড়াতে পারবে। আর্মির বুটের লাথি খেতে হবে না। মধ্যরাত্রে বাড়ী ঘর ঘেরাও করে আর্মি বিডিআর ছাত্র যুবকদের ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে না। মা-বোন-প্রিয়ার উপর অত্যাচার চালাবে না। সেনা ক্যাম্পের অন্ধকার কূপে বাপ-ভাইদের নিগৃহীত হতে হবে না। আর কোন মাকে সন্তানহারা, যুবতীকে স্বামীহারা বিধবা, শিশুকে পিতৃমাতৃহারা অনাথ হতে হবে না। সেনাবাহিনী উঠতি ছেলেদের মদ গাঁজা ফেনসিডিল খাইয়ে রসাতলে নিতে পারবে না। সমাজের উচ্ছন্নে যাওয়া বখাটে ছেলেদের ধ্বংসাত্মক কাজে লেলিয়ে দিয়ে অরাজকতা সৃষ্টি করা হবে না। 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংস করার' ভয়াবহ নীতি বন্ধ হবে। কেউই আর উপজাতি বলে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। হেয় চোখে দেখবে না। নিজের পাকা ধান কেউই আর জোরপূর্বক কেটে নিতে পারবে না। সমস্ত ধরনের নিপীড়ন নির্যতিন বন্ধ হবে। শোষণ-বঞ্চনার অবসান

সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে ঢাকায় পিসিপি সহ ৬টি ছাত্র সংগঠনের র‍্যালী, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

হবে। বেদখলকৃত জমি ফিরে পাওয়া যাবে। নিজের জায়গা জমি বসতভিটার উপর নিজের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। দু'মুঠো খেয়ে পরে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে। এটাই তো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ চেয়েছিলো, এখনো তাই চায়।

কিন্তু কি চাইতে গিয়ে কি পেলো জনগণ!!! যেখানে জনতার এখন গর্জে উঠে হিসেব চাইবার পালা, সেখানে আজ চোরের মা'র বড় গলা'র মতো অবস্থা। উল্টো জনগণকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে 'অকৃতজ্ঞ' বলে। অথচ ক্ষমতাসীন সরকার প্রধানের প্রতি 'গভীর- অগাধ-আস্থা ও বিশ্বাস আছে' তা প্রমাণের জন্য হেন কম্ম নেই যা করা হচ্ছে না। দোষ কেবল জনগণের!! জনগণ জাতীয় স্বার্থ বিকিয়ে দেয়া 'পার্বত্য চুক্তি'কে মেনে নেয়নি, নিচ্ছে না। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আগের যে কোন সময়ের চাইতে আরো দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে সংগঠিত হচ্ছে। এটাই হচ্ছে সরকারের দৃষ্টিতে বড় অপরাধ। এ 'অপরাধের' কারণে প্রতিটি সরকারই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যতন, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। আন্দোলনে ভাঙ্গন ধরাতে নানান ভূঁই পোড় সংগঠন খাড়া করে দেশে ও বিদেশে জুম্মো জনগণের ন্যায্য দাবি সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। অর্থ-ক্ষমতা-নিরাপত্তা-যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দিয়ে আপোষকামী, সুযোগসন্ধানী, পথভ্রষ্ট ও রণক্লান্ত অংশটিকে টেনে নিয়ে প্রকৃত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে এসেছে। এই পুরাণো খেলা আবার নতুন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে। এতে সাময়িক কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে বটে কিন্তু তাতে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়া যাবে না।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও আজ এটা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, সরকার যা চায় তা বাস্তবায়ন করে দিতে জনসংহতি সমিতির মধ্য হতে একটি গোষ্ঠি খুবই তৎপর। তার জ্বাজল্য দৃষ্টান্ত অনেক। পার্বত্য চুক্তি অসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির বাইরে কোন ধরনের আন্দোলনে যেতে ঐ গোষ্ঠিটি ইচ্ছুক নয়। সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না এটা দেখেও তারা চুক্তির বাইরে কোন কথা বলতে চায় না। সরকার সমস্ত কলাকৌশল খাটিয়েও যখন আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে পারেনি তাই এখন সর্বশেষ কৌশল হচ্ছে 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংস করা'। এই ফাঁদে পা দিয়ে জনসংহতি সমিতির প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠিটি সরকারের নীল নক্সা বাস্তবায়ন করে চলেছে। বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে পাহাড়ীদের গৃহহারা, জায়গা-জমিহারা সর্বশান্ত করার উদ্দেশ্য হাসিলের পর, সরকারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংস করা' এই ভয়াবহ নীতি কার্যকর করতে গেলে সরকারকে আন্দোলনকারীদের মধ্য হতে আপোষকামী, সুবিধাবাদী, আন্দোলনবিমুখ ও রণক্লান্ত অংশটিকে নিজ দলে টেনে নিতে হয়। তাদের অর্থ-ক্ষমতা-নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়। তারপর তাদের দিয়ে প্রকৃত আন্দোলনকারীদের সংগ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো যায়। তাদের নিজেদের মধ্যে সংঘাত লাগিয়ে দিতে পারলে, তাতে সরকার নির্দোষ সেজে থাকতে পারে। আন্দোলনকারীরা নিজ জাতির পক্ষ থেকে বাধা পেলে এত সহজে এগুতে পারে না। বাইরে থেকে দমন-পীড়ন করে দুনিয়ায় কোন আন্দোলনই স্তব্দ করে দেয়া যায়নি। তাই সরকার 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংসের' নীতি অবলম্বন করেছে।

'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদনকারী জনসংহতি সমিতি আর কালক্ষেপণ না করে প্রকৃত আন্দোলনকারীদের 'চুক্তি বিরোধী' আখ্যা দিয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জেহাদ ঘোষণা করে!! 'চুক্তি' জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করুক আর নাই করুক, 'চুক্তি বিরোধীদের' ধ্বংস করাই যেন জনসংহতি সমিতির প্রধান লক্ষ্যে

৭ম পাতায় দেখুন

সমঝোতা চুক্তি লংঘন করে ইউপিডিএফ-এর ওপর জেএসএস সন্ত্রাসীদের হামলা

২০ ফেব্রুয়ারী স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি লংঘন করে জেএসএস -এর সন্তু চক্র দু'টি পৃথক হামলায় ইউপিডিএফ-এর অন্ততঃ চার জন কর্মিকে খুন করে এবং বেশ কয়েকজনকে আহত করে। গত ৮ ও ২৮শে মার্চ খাগড়াছড়ির উত্তরে লোগাং এবং দক্ষিণে রাঙামাটির সীমান্ত এলাকায় এ হামলা হয়।

সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের ১৮ দিন পরই সন্তু চক্রের সন্ত্রাসীরা গত ৮ মার্চ লোগাং বাজার থেকে এক কিলোমিটার পূর্বে তারাবন ছড়ায় সশস্ত্র হামলা চালায়। সকাল পৌনে আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সন্ত্রাসীদের এই অতর্কিত হামলায় ইউপিডিএফ -এর দুই জন কর্মি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। এরা হলেন তারা কুমার চাকমা (১৮) পিতা গাচোঘা চাকমা, গ্রাম করল্যা ছড়ি, পানছড়ি ও কালাইয়্যা চাকমা (১৬) পিতা যধিষ্ঠির চাকমা, গ্রাম দুমবিল, করল্যাছড়ি থানা পানছড়ি।

ঘটনার সময় তারা অন্য তিন জন সহকর্মিসহ ১০ মার্চ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি উত্থাপন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মসূচী সফল করার জন্য গণসংযোগ সফরের আগে তারাবন ছড়া নদীর পাশে অবস্থিত চায়ের দোকানে কেনাকাটা করছিলেন। এ সময় দোকানের আশে পাশে ওঁৎ পেতে থাকা সশস্ত্র দলটি ইউপিডিএফ -এর কর্মিদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। তারা কুমার চাকমা গুলিবিদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুঠিয়ে পড়ে। আলো চাকমা ও ভারত মুনি চাকমা আহত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু কালাইয়্যা চাকমার পায়ে গুলি বিদ্ধ হওয়ায় সে বেশী দূর দৌঁড়াতে পারেনি। সে আহত অবস্থায় মাটিতে লুঠিয়ে পড়ে। এরপর সন্ত্রাসীরা তার শরীরে কয়েক রাউন্ড গুলি করলে সে মারা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা ১৮ জনের সন্ত্রাসী দলের দুই জনকে চিনতে সক্ষম হয়েছে। এরা হলো চিড়িংয়্যা চাকমা (কানাইয়্যা) ও জয়দেব চাকমা, উভয়েই আত্মসমর্পনকারী সাবেক শান্তিবাহিনীর সদস্য।

ঘটনার পর সন্ত্রাসীরা এখন লোকজনকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে ও হুমকি দিচ্ছে যাতে তারা ঘটনার সাথে জড়িতদের নাম ফাঁস না করে। গত ১০ই মার্চ চেঙ্গী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার অনিল চন্দ্র চাকমা ও মোহনী রঞ্জন চাকমাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করা হয় এবং হুমকি দেয়া হয়। এর পরদিন অর্থাৎ ১১ মার্চ জেএসএস সদস্যরা ঘটনাস্থলের দুই দোকানদার ও তাদের স্ত্রীদেরকে জেএসএস -এর আমতলী অফিসে ডেকে মানসিক নির্যাতন করা হয়। দোকানদার কালো চাকমার স্ত্রীর চুলের মুটি ধরে জেএসএস সন্ত্রাসীরা টান দেয় এবং হামলার জন্য জেএসএস-কে দায়ি করে কর্তব্যরত পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেয়ায় তার ওপর নির্যাতন চালায়।

অপর এক হামলায় গত ২৮শে মার্চ সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা মহালছড়ি থানাধীন পেঁন্নিয়াং এলাকায় সদয় সিন্ধু চাকমা ও সুইমং মারমাকে একই কায়দায় গুলি করে হত্যা করে। এরা দু'জনেই ইউপিডিএফ -এর সক্রিয় সদস্য। সকাল ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঐ সময় তারা সাংগঠনিক কাজে যাচ্ছিলেন। ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালালে গুলিবিদ্ধ হয়ে পানিতে ঝাঁপ দেয়। এর কয়েকদিন পর তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ২০ মার্চ ইউপিডিএফ ও জেএসএস -এর মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বহু কাঙ্খিত এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে এলাকায় সাধারণ লোকজনের মধ্যে বেশ আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু জেএসএস কর্তৃক শর্ত লংঘন করে ইউপিডিএফ -এর ওপর হামলার ফলে চুক্তির ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আদর্শচ্যুত জেএসএস তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বর্তমানে প্রতারণা, শঠতা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিচ্ছে ঐ দুই হামলা তারই প্রমাণ। এতসব সত্বেও ইউপিডিএফ বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে সমঝোতা চুক্তির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলছে। ❑

পুলিশি প্রহরায় সন্ত্রাসীর বিয়ে!

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত আসামী, এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলরাম চাকমার (৩৫) বিয়ে কড়া পুলিশি প্রহরায় সম্পন্ন হয়েছে। গত ৯ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলার ভাইবোন ছড়া এলাকার দেওয়ান পাড়ায় এ অসম্ভব ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, এটি বলরামের চতুর্থ বিয়ে।

বলরাম চাকমা এলাকায় একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসী, মাস্তান ও চাঁদাবাজ হিসেবে 'কুবিদিত'। তার বিরুদ্ধে থানায় অনেক মামলা ঝুলে রয়েছে। আইনের ভাষায় সে এখন পলাতক। গত বছর জুন মাসে সে তার দলবল নিয়ে শিবমন্দির এলাকায় হামলা চালিয়ে বহু দোকান ঘর পুড়ে দেয়। থানায় অনেক মামলা থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না পুলিশ। বরং উল্টো পুলিশ তাকে যত্ন আত্তি করে বিয়ে পড়িয়ে দেয়। কারণ সে জেএসএস-এর সমর্থক ও সক্রিয় কর্মি। পুলিশী প্রহরায় সন্ত্রাসীর বিয়ে দেখে এলাকায় নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

পিসিপি কমলছড়ি ইউপি শাখা কমিটি গঠিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ গত ১৭ জানুয়ারী'২০০০ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কমলছড়ি ইউপি শাখা গঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কমলছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বীর বাহু চাকমা। পিসিপি'র প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাখার সহসভাপতি জেলাস চাকমা।

সভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলন ছাড়া জুম্ম জনগণের আর কোন বিকল্প নেই। এলাকায় সংঘটিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় ঐক্যবদ্ধ থাকতে না পারলে এলাকায় সন্ত্রাস বেড়ে যাবে, সাধারণ জনগণের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা যাবে না।

সভায় পরে সকলের সম্মতিতে প্রতিবাদ চাকমা (চয়ন)কে সভাপতি, পুলক জীবন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং বিজয় চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠিত হয়।

আলোচনা সভায় এলাকার ৩৯ জন ছাত্র-গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন হিরণ বাহু চাকমা।

বান্দরবানে অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ ১৫ মার্চ বান্দরবানে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বালাঘাটা বাজারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মংসু মারমা। বক্তব্য রাখেন চম্পানন চাকমা, ডমিনিক ত্রিপুরা, বেনজিন চাকমা, মেকি খীসা, উসাইনু মারমা, বিজয় তঞ্চঙ্গ্যা, পলুমং মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৯৯৫ সালে এই দিনে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটেলাররা পাহাড়ীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শতাধিক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। আজ পর্যন্ত সে ঘটনার কোন বিচার হয়নি। বরং ঘটনার সাথে জড়িত সেনাবাহিনী ট্রেনিং সেন্টারের নামে আবারো ভূমি অধিগ্রহণ করতে শুরু করেছে। এর ফলে হাজার হাজার পাহাড়ী পরিবার নিজ জায়গা জমি থেকে উৎখাত হবে ও ভূমিহীন হয়ে পড়বে। বক্তারা জনগণকে সরকারের এ ধরনের উচ্ছেদ নীতির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার থাকার আহ্বান জানান। তারা বলেন, আর সহ্য করা হবে না। বহু অন্যায় অবিচার করা হয়েছে। এবার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সরকারের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বিরোধী যে কোন ষড়যন্ত্রের সমুচিত জবাব দিতে হবে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিল ১০ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে।

সৈকত চাকমার সভাপতিত্বে কাউন্সিল অধিবেশনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক চম্পানন চাকমা। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নির্নিমেষ চাকমা, অংশু থুই মারমা, জেফারসন চাকমা ও উমিমং মারমা।

বক্তারা জেএসএস সন্ত্রাসীদের দ্বারা একের পর এক পিসিপি ও ইউপিডিএফ কর্মি খুন হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তারা সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও বেগবান করার আহ্বান জানান এবং জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন জোরদার করে জেএসএস সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বক্তারা আরো বলেন, শেখ মুজিব জোর করে পাহাড়ীদেরকে বাঙালী বানাতে চেয়েছিল, আর শেখ হাসিনার সরকার কৌশলে তাই করতে চাইছে। এ ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সাত সদস্য বিশিষ্ট নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। নেচার চাকমাকে আহ্বায়ক, অংশুথুই মারমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও লিভিং স্টোন চাকমাকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন সুনির্মল চাকমা, রূপন চাকমা, উমিমং মারমা ও জেফারসন চাকমা।

সাংগঠনিক কার্যক্রম

বিশ্ব নারী দিবসের সভায় বক্তারা

কল্পনা চাকমা অপহরণের বিচার চাই

স্বাধিকার প্রতিবেদন॥ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ১০ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সংগঠনের সভানেত্রী কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বিশ্ব নারী দিবস শুধু আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য নয়। বাস্তবিক অর্থে আন্তর্জাতিক নারী দিবস লড়াই সংগ্রাম করার শপথ নেয়ার দিন। শাসক শোষক গোষ্ঠী কখনো নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসবে না। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লোকদেখানোভাবে নারী অধিকারের স্বপক্ষে কথা বলে থাকে। তাই নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদেরকে লড়াই সংগ্রাম করে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী নিপীড়ন, শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলছে তার মধ্যে নারীর সংগ্রাম একটা প্রধান সংগ্রাম। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে নারীর সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। পাহাড়ে যে জাতিগত নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চলছে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামও দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার নারী অধিকারের কথা বললেও লে: ফেরদৌস কর্তৃক অপহৃত কল্পনা চাকমাকে উদ্ধারের জন্য সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে পারেনি। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। বক্তারা অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণের বিচার ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রবি শংকর চাকমা, মোশরেফা মিশু, আনু মুহাম্মদ, মেঘনা গুহঠাকুরতা, মানস চৌধুরী প্রমুখ।

আলোচনা সভার পর 'পাহাড়ের রুদ্ধকণ্ঠ' নামে একটি পথ নাটক পরিবেশন করা হয়। পাহাড়ের আন্দোলনের ইতিহাসে এ পথ নাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রথম প্রকাশনা 'পাহাড়ের রুদ্ধকণ্ঠ' বইয়ের মূল বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে এ পথ নাটকটি রচিত হয়। মানস চৌধুরী রচিত ও নির্দেশিত এ নাটকে অভিনয় করেন মেকী খীসা, দীপ্তা চাকমা, সমারী চাকমা, সায়দিয়া গুলরুখ, সুপ্রকাশ চাকমা, দীপঙ্কর ত্রিপুরা, বোধিল চাকমা, তানভির মুরাদ, বেনজিন চাকমা, শাহিদা পারভিন, রিপন চাকমা, হেনরিয়েটা বিশ্বাস ও মিনুচিং মারমা।

বিভিন্ন স্থানে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি দিবস পালিত

স্বাধিকার প্রতিবেদন॥ ১০ মার্চ পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি উত্থাপন দিবস। ১৯৯৭ সালের এদিনে জনসংহতি সমিতির চেলাচমুভারা যখন জনগণের প্রধান প্রধান দাবিগুলো ছাড় দিয়ে সরকারের সাথে আপোষের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন লড়াকু সংগঠন পাহাড়ী গণ পরিষদ, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এ দাবি উত্থাপন করে। এরপর এ দাবিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জনসংহতি সমিতির সন্তু চক্র আপোষের পথে এ দাবিকে বাধা মনে করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং তিন সংগঠনের অনেক কর্মিকে মারধর করে ও হুমকি দেয়। কিন্তু ইদানিং পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবির প্রতি জনগণের সমর্থন দেখে সন্তু চক্র তার সুর পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। সরকারের সাথে আঁতাত করা এই চক্রটি বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, তারাও চাই পূর্ণস্বায়ত্তশাসন। তাদের দাবিনামার মধ্যেও নাকি এক সময় এই দাবিটি ছিল।

দিবসটি পালনের জন্য তিন সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন স্থানে দিবসটি পালিত হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এ দিন একটি র‍্যালী বের করে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে মিছিল শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি প্রদক্ষিণ করে সন্ত্রাস বিরোধী ভাস্কর্যের পাদদেশে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বেনজিন চাকমা ও মিঠুন চাকমা। বক্তারা বলেন, আজ এটা পরিষ্কার যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হবে না। জেএসএস জুম্মদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সরকারের সাথে আপোষ চুক্তি করেও কোন সমাধান হয়নি। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী সমাধানের জন্য নতুন করে আলোচনায় বসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রামে আলোচনা সভা

পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবির তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে ১০ মার্চ চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম ইউনিট এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় বক্তারা বলেন, ইতিমধ্যে তথাকথিত শান্তি চুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী সমাধানের জন্য অবিলম্বে পূর্ণস্বায়ত্তশানের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ধ্রুবজ্যোতি চাকমা, সঞ্চয় চাকমা, পিসিপি কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রূপক চাকমা, মহানগর সভাপতি সৌমিত্র চাকমা, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব চাকমা প্রমুখ।

খাগড়াছড়িতে মিছিল ও সমাবেশ

দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে খাগড়াছড়িতে পাহাড়ী গণ পরিষদের উদ্যোগে মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন কর হয়। মিছিলটি খাগড়াছড়ির গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্বনির্ভর বাজারে এসে শেষ হয়। পাহাড়ী গণ পরিষদের কেন্দ্রীয় পুনগঠন কমিটির সদস্য দীপায়ন খীসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তারা বলেন, দাবি উত্থাপনের তিন বছরের মধ্যে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের পক্ষে বিশাল জনসমর্থন শাসকগোষ্ঠির জন্য বিরাট ভীতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসকগোষ্ঠি তথাকথিত শান্তিচুক্তির উপর ভর করে জেএসএস -কে ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। সরকারী ফাঁদে পা দিয়ে জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীরা গত ৭ ফেব্রুয়ারী বাবুছড়ায় দেবোত্তম চাকমাকে, ৮ মার্চ পানছড়ির তারাবন্যায় ইউপিডিএফ-এর দুই কর্মিকে খুন করেছে। বক্তারা এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে ইউপিডিএফ-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুগপৎ ভাবে অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন চালানোর জন্য জেএসএস-এর প্রতি আহ্বান জানান। ইউপিডিএফ চিহ্নিত প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যতীত জনগণের সকল শক্তিকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে যেতে প্রস্তুত বলেও বক্তারা মত প্রকাশ করেন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পুলক চাকমা, সোনালী চাকমা, জেলাস চাকমা, সাইদি অং মারমা প্রমুখ।

পিসিপি'র সম্পাদক মন্ডলীর সভা অনুষ্ঠিত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সভা ১১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মংশে মারমা, সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য দেবোত্তম চাকমা ও ইতিপূর্বে বিভিন্নভাবে নিহত জানা অজানা সহযোদ্ধাদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপর সভায় সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা পর্যালোচনা ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সম্পাদক মন্ডলীর সভার এক প্রস্তাবে বলা হয়, জেএসএস ইউপিডিএফ-এর উত্থানে শংকিত হয়ে পড়েছে। তাই অধঃপতিত এই দলটি আত্মসমর্পনের পরও খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ করে ও হুমকি দিয়ে ইউপিডিএফ-এর উত্থানকে রোধ করার ব্যর্থ অপচেষ্টা চালাচ্ছে। সভায় জেএসএস-এর এই ঘৃন্য নীতির সমালোচনা করা হয় এবং জেএসএস নেতৃবৃন্দকে সন্ত্রাস পরিহার করে সৎ সাহস দেখিয়ে ইউপিডিএফ -কে রাজনৈতিক ও আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় অপর এক প্রস্তাবে বলা হয়, বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে।

এগার সদস্য বিশিষ্ট সম্পাদক মন্ডলীর মধ্যে দশ জন সম্পাদক এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শোক সংবাদ

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মি বাঘাইছড়ি থানা শাখার প্রকাশনা সম্পাদক মাদঙ্গ মণি চাকমা (২৬) গত ৩১ জানুয়ারী, ২০০০ বরিশালের গৌরনদী থানায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি বরিশালে চাকুরীরত এক নিকট আত্মীয়ের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দশ ভাইবোনের মধ্যে তিনিই সর্বকনিষ্ঠ। তিনি বাঘাইছড়ি কলেজ থেকে ১৯৯৮ সালে বিএ পাশ করেন এবং কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে (দূরশিক্ষণ) তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

তার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির এক বিবৃতিতে বলা হয়, তার মৃত্যু সংগঠনের এবং এলাকার জন্য এক অপুরণীয় ক্ষতি। তিনি অত্যন্ত সম্ভবনাময়ী ও উদ্যোমী কর্মি ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।

চট্টগ্রামে সদ্য কারামুক্তদের সংবর্ধনা

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ ইউপিডিএফ- এর উদ্যোগে ১৮ মার্চ চট্টগ্রামের নন্দন কাননস্থ বুড্ডিষ্ট ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে সদ্য কারামুক্ত ইউপিডিএফ ভুক্ত পিসিপি'র নেতা কর্মি ও সমর্থকদের জন্য এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য ধ্রুব জ্যোতি চাকমা।

সভার শুরুতে সদ্য কারামুক্তদের ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। এরপর বক্তারা কারামুক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আপনাদের কারাবরণ ও মুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় হিসাবে লেখা থাকবে। সমাবেশে হামলা, গ্রেফতার, নির্যাতন ও জেল জুলুম চালিয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়া যায় না। মুক্তিকামী মানুষকে জোর জবরদস্তি করে দমানো যায় না। যুগে যুগে মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের জয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত। যদিও এর জন্য জনগণকে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিপীড়ন নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। পরাক্রমশালী ব্রিটিশদের শাসনামলে বিপ্লবীদেরকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এ দেশের জনগণকে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী শাসক শোষক গোষ্ঠির পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায় সঙ্গত পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনও জয়যুক্ত না হয়ে পারে না। কোন প্রকার ষড়যন্ত্র, জেল জুলুম ও বর্বর দমন পীড়ন চালিয়ে এ বিজয়কে রোধ করা যাবে না।

বক্তারা আরো বলেন, জুম্ম জনগণের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে। জে: জিয়াউর রহমান সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন করে দুই ভ্রাতৃপ্রতিম জনগোষ্ঠির মধ্যে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে। ট্রাইবেল কনভেনশন গঠন করে দালাল গোষ্ঠি সৃষ্টি করেছে। জে: এরশাদ ঐ দালালদের দিয়ে তথাকথিত জেলা পরিষদ গঠন করেছে। খালেদা জিয়ার শাসনামলে অলি আহম্মদের প্রত্যক্ষ উস্কানীতে মুখোশ বাহিনী গঠন করে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমনের অপচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তবুও আন্দোলন থেমে থাকে নি, বরং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামী জনগণ এ সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বর্তমানে সরকার জনগণের আন্দোলন সংগ্রামকে দমন করার জন্য জেএসএস'কে নব্য মুখোশ বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু অতীতের মতো সরকারের এ ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে জনগণ এক বার জেগেছেন, তাদেরকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না কোনভাবেই।

বক্তারা জেএসএস'কে সরকারের কোল থেকে বেরিয়ে এসে জুম্ম জনগণের আন্দোলন সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। ভ্রাতৃঘাতি কার্যকলাপের ফলে জনগণের কোন মঙ্গল হবে না বলে বক্তরা জেএসএসকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং আন্দোলনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করার জন্যও আহ্বান জানান।

বক্তব্য রাখেন সঞ্চয় চাকমা, শান্তিদেব চাকমা, রূপক চাকমা, উথোয়াই চিং মারমা, সৌমিত্র চাকমা, বিরাজ ময় চাকমা এবং সদ্য কারামুক্তদের পক্ষে বিদ্যুৎ চাকমা, শান্তিপ্রিয় চাকমা, সহদেব চাকমা ও চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

এলাকা সংবাদ

রিজার্ভ বাজারে দুই নাম্বারীদের কান্ড!

সন্ত্র চক্রের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসীরা অপহরণে বেশ পারঙ্গমতা দেখিয়ে চলেছে। যে কাউকে সুযোগ পেলেই এরা জোরপূর্বক অপহরণ করে থাকে। মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়েই কেবল তারা অপহৃতদের ছেড়ে দেয়। ফলে অপহরণ তাদের জন্য এক লাভজনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া অমানুষিক শারিরীক নির্যাতন তো রয়েছেই। অনেক সময় মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হলে সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের গুম করে ফেলে। গত মধ্য জানুয়ারীতে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন পক্ষের সমর্থক সন্দেহ করে দুই নাম্বারীরা জুরাছড়ির ডেবাপাড়ার আনন্দ চাকমা (১৯) নামে এক তরুণকে জোরপূর্বক অপহরণ করে। সে জনৈক ব্যবসায়ীর সাথে রাঙামাটির রিজার্ভ বাজারে গেলে ঐ ঘটনা ঘটে। দুই নাম্বারীরা যে মুহূর্তে আনন্দকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ঐ ব্যবসায়ীটি কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে তা জিজ্ঞাসা করে। এর উত্তরে দুই নাম্বারীরা বলে যে, "সে 'শান্তি চুক্তি' সমর্থন করে না। তাই তাকে শায়েস্থা করা হচ্ছে"। অপহরণের খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে লোকজন ক্ষুব্ধ হন। কারণ আনন্দ চাকমার মতো সহজ সরল ছেলেরা পর্যন্ত সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে রেহাই পায় না। দুই নাম্বারীরা আনন্দকে মারধর করে একদিন পর ছেড়ে দেয়। উল্লেখ্য, আনন্দ চাকমা খেটে খাওয়া' কৃষকের ছেলে। দুই নাম্বারীরা মুক্তিপণ আদায় করার জন্য এ ঘটনাটি ঘটিয়েছিল।

মাতাল অবস্থায় জেএসএস সদস্য কর্তৃক জনৈক শিক্ষকের বাড়ি ভাংচুর

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ দীঘিনালা থানার বড়াদাম গ্রামের জেএসএস সদস্য কান্তি চাকমা (শান্তিবাহিনীর নাম জোসেফ) গত ১৯ ফেব্রুয়ারী বড়াদাম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক নলিনী মোহন চাকমার বাড়িতে মাতাল অবস্থায় হামলা চালায়। সে বাড়ীর জানালা ও বেড়া ভেঙে দেয় এবং অশ্লীল ভাষায় বাড়ির লোকজনকে গালিগালাজ করে। সারেন্ডারের পরও দাপট দেখাতে সে এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় গ্রামের লোকজনের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, জোসেফ বড়াদাম এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, চাঁদাবাজি, হামলা, অপহরণ ঘটনার সাথে জড়িত। সে '৯৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর রাত ১১টায় মাতাল অবস্থায় ভারসাম্য হারিয়ে নিজ কোমরে রাখা অস্ত্রের গুলিতে আহত হয়েছিল। সে সময় এ ঘটনাকে বিকৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রচার করা হয়।

পানছড়িতে পিসিপি'র সাবেক কর্মি অপহৃত

স্বাধিকার রিপোর্ট ॥ গত ২৯ জানুয়ারী পানছড়ি থানার লতিবান এলাকার তালতলা নামক স্থান থেকে পিসিপি'র সাবেক কর্মি শুভ কান্তি চাকমা (৩০) জেএসএস সমর্থনপুষ্ট দুই নাম্বারীদের হাতে অপহৃত হন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবারের পক্ষ থেকে ধারণা করা হচ্ছে দুই নাম্বারীরা তাকে অপহরণ করে হত্যা করেছে। তিনি লোগাং-এর এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাচ্ছিলেন। বর্তমানে পিসিপি'র সাথে যুক্ত না থাকলেও তিনি পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের একজন সমর্থক। পানছড়ি থানায় লতিবান ও কলেজ গেইট এলাকায় দুই নাম্বারীরা প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি ও অপহরণের মত ঘটনা সংঘটিত করলেও তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নেয় না। দুই নাম্বারীদের কার্যকলাপে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

নিরাপত্তাহীনতায় কুহেলী চাকমা

জেএসএস সন্ত্রাসীরা গত ৭ ফেব্রুয়ারী ইউপিডিএফ নেতা দেবোত্তম চাকমাকে গুলি করে খুন করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলের পাশে অবস্থিত বাড়ির লোকজন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে কুহেলী চাকমা অনেকের মত সেও ঘটনায় যা দেখেছে তার বিবরণ দেয়। পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেয়াটাই যেন এখন তার অপরাধ হয়েছে। জেএসএস-এর মদদপুষ্ট খুনী সন্ত্রাসীরা তাকে এজন্য বার বার হুমকি দিচ্ছে। সাক্ষ্য প্রত্যাহার করার জন্যও তার ওপর চাপ দেয়া হচ্ছে। তা না হলে সন্ত্রাসীরা তাকে খুন করবে বলেও হুমকি দিয়েছে। সে বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

বান্দরবানে সেনাবাহিনীর এসএমজি উধাও, কিছু প্রশ্ন!

স্বাধিকার প্রতিবেদন ॥ বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি থানার কচ্ছপতলি সেনাক্যাম্প থেকে একটি অত্যাধুনিক অস্ত্র এসএমজি উধাও হলে এ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অস্ত্র হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ঘটে ২ ফেব্রুয়ারী। কিন্তু খবরটি দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয় ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০০। বিষয়টি সেনারা প্রথমদিকে গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্ত পরে জানাজানি হয়ে গেলে তা আর গোপন রাখা যায়নি।

জানা যায়, ঘটনার দিন রাতে জনৈক সেনা জোয়ান ক্যাম্পের সেন্ট্রি পোষ্টে দায়িত্ব পালন করতে যায়। কিন্তু ঐ সেনাটি নিজ দায়িত্ব অবহেলা করে অস্ত্রটি পোষ্টে ফেলে রেখে পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী গ্রামে ঘুরতে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখে অস্ত্রটি নেই। পরদিন সেনারা কোন কারণ ছাড়াই গ্রামের লোকজনের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালায়। তখনও পাড়ার লোকজন কোন কিছু বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া সেনারা পার্শ্ববর্তী পাহাড়েও ব্যাপক তল্লাশি চালায়, রাস্তায় চেকপোষ্ট বসিয়ে নিরীহ জনগণকে তল্লাশির নামে হয়রানি করে। সেনাদের হঠাৎ এ ধরনের তৎপরতার ফলে বিষয়টি আর পরে গোপন থাকেনি।

সেনা সদস্যরা বার্মার বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষে অস্ত্রটি খোয়া গেছে বলে প্রচারণা চালিয়ে আসল ঘটনাটি ঢামাচাপা দিতে চেষ্টা চালায়। কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক প্রচার হওয়ায় সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পরে সেনারা প্রচার করে যে ভুল বশত: পপি গাছ নির্মূলের জন্য অপারেশনে বের হওয়া কোন গ্রুপের সাথে চলে গেছে। কিন্তু এ ধরনের প্রচারণাও হালে পানি পায়নি। পরে ক্যাম্পের পুরো গ্রুপটিকে বান্দরবান ব্রিগেডে ক্লোজ করা হয় বলে জানা গেছে। তবে অস্ত্রটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। অস্ত্রটি উধাও হওয়া, তল্লাশির নামে নিরীহ জনগণের উপর হয়রানি, তথ্য গোপন করে ঘটনাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা -এসবের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা সদস্যদের প্রকৃত চরিত্র ফুটে ওঠে। জনমনে সেনাবাহিনীর শৃংখলা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। বলা হয়, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু লোকজনের জিজ্ঞাসা, যারা নিজের কাঁধের অস্ত্র হারিয়ে ফেলে, ক্যাম্পের সেন্ট্রিপোষ্ট থেকে দায়িত্ব কর্তব্য ফেলে অন্ধকার রাত্রে পাড়া গ্রামে ঘুরতে যায় (নাকি অলিখিত কোন কর্তব্য পালন করতে যায়!), তারা কিভাবে বহি:শত্রুর বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবে! পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনারা কেবল নিরীহ নিরস্ত্র পাহাড়ীদের উপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাতেই ওস্তাদ। অপহরণ, নারী নির্যাতনই যেন তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তব্য যদি নাই হবে তবে কল্পনার অপহরণকারী লে: ফেরদৌস ও তার সহযোগী ভিডিপি সদস্যদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না। এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত গণহত্যার সাথে জড়িত সেনা কর্মকর্তা ও সাধারণ সদস্যদের বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। কোন সভ্য দেশে এটা নজীর বিহীন। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সেনাশাসন কবলিত ইন্দোনেশিয়াতে পর্যন্ত আজকাল পূর্ব তিমোরে গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্তদের বিচারের আয়োজন করা হচ্ছে।

যাই হোক, অভিজ্ঞ মহলের অভিমত অস্ত্রটি উধাও হওয়ার পিছনে সেনাদের কারোর হাত থাকতে পারে। কারণ কোন সাধারণ বেসামরিক লোক রাতের অন্ধকারে সেনা ক্যাম্পে গিয়ে অস্ত্র চুরি করে নিয়ে আসার মত সাহস দেখাবে তা এক অসম্ভব ব্যাপার। ক্যাম্পের মধ্যে থাকা সেনা সদস্য ছাড়া কেউই এ কাজ করতে পারে না। বর্তমানে অস্ত্র ব্যবসাও বেশ জমজমাট। একটি আধুনিক অস্ত্রের দাম অনেক। তা ছাড়া অতীতে সেনা অফিসারদের এ ধরণের ব্যবসার সাথে যোগ থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অস্ত্রটি চুরি করা হয়ে থাকতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

জেএসএস সদস্য বড়খুল'র অত্যাচারে বাবুছড়ার জনগণ অতিষ্ঠ

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ দীঘিনালা থানার বাবুছড়া এলাকায় জেএসএস সদস্য নরেশ চাকমা (বড়খুল)-র নেতৃত্বে এক দল সশস্ত্র সন্ত্রাসীর অত্যাচারে এলাকার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এ সশস্ত্র দলটি বিভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে লোকজনকে নানা ভাবে অত্যাচার, হয়রানি, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করে আসছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারী ভোর বেলায় ইন্দ্রমণি কার্ব্বারী পাড়ায় এ দলটি সশস্ত্র হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা গ্রাম থেকে তিন জন যুবককে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বেদম মারধর করে। এ তিন জন হলেন অনিল চাকমা (২২), প্লানেট চাকমা, প্রাণকুমার (২৮) ও ভাগ্যশ্বর চাকমা (৩০)। অনিল চাকমা মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় এখনো চিকিৎসাধীন আছেন।

সন্ত্রাসীদের ঐ দলটি ইতিপূর্বে ৪ ফেব্রুয়ারী জেএসএস সদস্য ইন্দু বিকাশ ও বড়খুল'র নেতৃত্বে একই গ্রামে আবার হামলা চালায়। এ সময় তারা গ্রামবাসীদের সন্ত্রস্ত করার জন্য আক্রমণের পূর্বে ২০/২৫ রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে। তারপর গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালায়। লোকজনকে বেধড়ক মারধর করে। অনেকের বাড়ির জিনিস পত্র লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। তারা বিন্দুরাজ চাকমার বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রী ও কন্যাকে অমানুষিকভাবে মারধর করে। তাদের কাছ থেকে সোনার চেইন ও কানের দুল ছিনিয়ে নেয়। গ্রামের দোকানদার লেদ্য চাকমার (২৫) উপর শারিরীক নির্যাতন চালানো হয়। তার মা তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে, তাকেও সন্ত্রাসীরা মারধর করে মারাত্মকভাবে জখম করে। শুধু তাই নয়, হামলাকারীরা লেদ্য চাকমার দোকান ভাংচুর করে ও জিনিস পত্র লুট করে নিয়ে যায়। গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ির জিনিস পত্র তছনছ করে দেয়। এছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম বৈদ্য পাড়া ও শণখোলায় পাড়াবাসীদের উপরও নির্যাতন চালায় জেএসএস -এর সন্ত্রাসী বাহিনী। তারা লোকজনকে হুমকি দেয় ও গালিগালাজ করে এবং ঘরে ঘরে তল্লাসী চালায়। উল্লেখ্য, এর আগে জেএসএস-এর ঐ কতিপয় দুর্বৃত্ত ২২ জানুয়ারী রাত ৮ টায় এবং এরপর ২৫ জানুয়ারী ভোর ৫ টায় ঐ গ্রামে হামলা করতে গেলে গ্রামবাসীদের সন্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কতিপয় জেএসএস সদস্য কর্তৃক বার বার হামলায় এলাকার জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে উপর্যুপরি ডাকাতি, প্রশাসন নীরব

স্বাধিকার প্রতিনিধি ॥ গত ২৯ জানুয়ারী এবং ৪ ও ৫ ফেব্রুয়ারী জেএসএস-এর সমর্থনপুষ্ট মায়াভূষণ-তাপস-করিম সন্ত্রাসী দল কর্তৃক চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কে কালাপানি নামক এলাকায় উপর্যুপরি দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে। সন্ত্রাসীরা ৪ ও ৫ তারিখ দুই দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বাস, ট্রাক ও মাইক্রোবাস থামিয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে যাত্রীদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। প্রশাসন ডাকাতির ঘটনা জানলেও, এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ফলে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, এ সন্ত্রাসী গ্রুপটি মানিকছড়ি থানার হাফছড়ি এলাকার জনগণ থেকে তাড়া খেয়ে এখন একই থানার দুলু ও মাটিরাঙ্গা থানার ওয়াছু নামক স্থানে দুই নাম্বারীদের সাথে গোপনে যোগাযোগ রেখে অবস্থান নিয়েছে। সেখান থেকেই তারা ডাকাতি করে থাকে। এলাকায় ব্যাপক চাঁদাবাজিও শুরু করে দিয়েছে এই ডাকাত দলটি। জনগণ তাদের ভয়ে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না। অপরদিকে ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিরা প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানালেও প্রশাসন রহস্যজনক কারণে নীরব রয়েছে। ডাকাতির ঘটনা এমন জায়গায় সংঘটিত হচ্ছে যেখান থেকে আর্মি ক্যাম্প খুব বেশী দূরে নয়। ফলে জনমনে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই সন্ত্রাসী দলের হাতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সদস্য মংশে মারমা খুন হন এবং মারমা সম্প্রদায়ের নেতা ম্রাগ্য মারমা সহ অপর দু'জন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে জখম হন। ঐ ঘটনার পর জনতা উত্তেজিত হয়ে সন্ত্রাসী দলকে ধাওয়া করে। বর্তমানে তারা উপরোল্লেখিত স্থানে অবস্থান নিয়ে ডাকাতিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে।

ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই, প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ দীঘিনালা-বাবুছড়া সড়কে জেএসএস'র প্রত্যক্ষ মদদে দুই নাম্বারীদের প্রকাশ্যে চাঁদাবাজি, ছিনতাই ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুই নাম্বারী হিসেবে পরিচিত এই সন্ত্রাসীরা জেএসএস-এর আত্মসমর্পণের পর থেকেই প্রকাশ্যে এই অপতৎপরতা চালিয়ে আসছে। প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী বড়াদামের কার্ব্বারী টিলায় জাগুলুক্যা চাকমা নামের এক বাঁশ ব্যবসায়ীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দুর্বৃত্তরা তার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা যাতে ফাঁস না হয় তার জন্যও তাকে হুমকি দেয়া হয়। যে জায়গায় ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে সেখান থেকে আর্মি ক্যাম্প খুব বেশী দুরে নয়। অথচ দীর্ঘ দিন ধরে দুই নাম্বারীরা সেখানে অবাধে চাঁদাবাজি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মত ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। মদ, গাঁজা, হিরোইন, ফেনসিডিল সেবন ও জুয়ার আসর চলে নিয়মিত। প্রশাসন ও সেনা কর্তারা দেখেও না দেখার ভাণ করেন। দু'নাম্বারীদের এ কার্যকলাপে বাঁধা দিতে গিয়ে ঐ পাড়ার প্রধান সরোজ মোহন কার্ব্বারীকে গত বছর প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এখনো পর্যন্ত খুনিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। দীঘিনালায় এ সন্ত্রাসীদের নিয়ে প্রতিবেদন অনেক বার স্বাধিকারে প্রকাশিত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের কার্যকলাপে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

জেএসএস সন্ত্রাসীদের হাতে ইউপিডিএফ-এর আরো এক কর্মি খুন

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ জেএসএস-এর কতিপয় সন্ত্রাসীর হামলায় গুরুতর আহত ইউপিডিএফ-এর এক কর্মি ২ মার্চ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। নবীন বিশ্ব চাকমা (৪৫) পিতা: মৃত বাদিরাম চাকমাকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারী সকাল পৌনে ৯টার দিকে জেএসএস সদস্য অনুতোষের নেতৃত্বে দশ/পনের জনের একটি সশস্ত্র দল "রস্যাবিল উপর পাড়ায়" হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা প্রথমে তাকে অমানুষিকভাবে নির্যাতন করে। এতে ক্ষান্ত না হয়ে সন্ত্রাসীরা তার উপর গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। পরে পার্শ্ববর্তী এলাকার জনগণ তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেয়। তিনি ১৫ দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করেন। নবীন বিশ্ব রাঙ্গুনীয়া থানাধীন রাজানগর ইউনিয়নের চৌচলা বিল গ্রামের বাসিন্দা। তার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বান্দরবানে কিশোরীর শ্লীলতাহানীর চেষ্টা

বান্দরবান প্রতিনিধি॥ গত ৪ মার্চ বান্দরবান জেলার চিম্বুক-থানচি সড়কে এম্পো পাড়ার কাছে এক সেনা সদস্য মুরুং সম্প্রদায়ের এক কিশোরীর শ্লীলতাহানীর চেষ্টা চালায়।

জানা যায়, ঐ দিন সকাল ১০টার দিকে উক্ত কিশোরী (নাম প্রকাশ করা হলো না) পাড়ার পার্শ্ববর্তী ঝর্ণা থেকে পানি আনতে গেলে ১৬ ই: বে:এর লেন্স নায়ক মুজিবর তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। এতে রাজী না হওয়ায়, এক পর্যায়ে তাকে ঝাপতে ধরার চেষ্টা করে। কিশোরী তার তুরুংটি (পিঠে করে বহনের জন্য এক ধরণের বাঁশের তৈরী ঝুরি বিশেষ) ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ঘটনাটি পাড়ায় জানাজানি হলে যুবকরা তার প্রতিবাদ জানায় ও ঘটনার বিচার দাবি করে।

উল্লেখ্য, চিম্বুক-থানচি সড়কের প্রায় ৪৮ কি:মি: রাস্তা এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর (১৬ ই:বে:) নির্মাণের কাজ হাতে নেয়। ১৯৯৬ সাল থেকে এ কাজ চলছে। সেই থেকে এলাকার জনসাধারণ সেনা সদস্যদের দ্বারা নানাভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছে। স্থানীয় মুরুংদের সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকেও সেনারা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে বন ধ্বংস করে দিচ্ছে। অনেক বাঁধা দেয়া সত্ত্বেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় না। এ নিয়েও মুরুং জনগোষ্ঠির মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ বিরাজ করছে।

সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ❑ ১২ এপ্রিল ২০০০ ❑ বুলেটিন নং ১৪

আভ্যন্তরীণ শরণার্থী পুনর্বাসন প্রসঙ্গ

গত ১৪ মার্চ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের ১৪তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসংহতি সমিতি আভ্যন্তরীণ শরণার্থীর তালিকা থেকে বহিরাগতদের বাদ দেয়ার দাবিতে এ সভা বয়কট করে। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের অন্যতম নেতা বকুল চন্দ্র চাকমাও অনুপস্থিত থাকেন। বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি, তবে প্রেস ব্রিফিং -এ টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান দীপংকর তালুকদার ধূর্ততার সাথে বলেন, আভ্যন্তরীণ পাহাড়ী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কথা চুক্তিতে থাকলেও বহিরাগতদের পুনর্বাসন করা যাবে না সে রকম কোনকিছু চুক্তিতে উল্লেখ নেই।

বস্তুত: পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদেরক দেশের শাসক শোষক গোষ্ঠি বরাবরই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আশির দশকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গোপন সার্কুলারের মাধ্যমে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। প্রথমত: পার্বত্য এলাকায় জন ভারসাম্য পরিবর্তন করে পাহাড়ীদেরকে নিজ এলাকায় সংখ্যালঘু করে ফেলা এবং দ্বিতীয়ত: জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনের জন্য তাদেরকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা। সেনাবাহিনী এ কাজটি অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করে। এর ফল হয় মারাত্মক ও ভয়াবহ। বছরের পর বছর ধরে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মধ্যে যে সম্প্রীতির ঐতিহ্য ছিল তা ধ্বংস হয়। তার বদলে ভ্রাতৃপ্রতিম দুইটি জনগোষ্ঠির মধ্যে বিদ্বেষ হানাহানি বৃদ্ধি পায়। সরকার ও সেনাবাহিনী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব জিইয়ে রেখে তার হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়।

বহিরাগতদেরকে সামরিক উদ্দেশ্যে ও শাসক শোষক গোষ্ঠির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কাজটি যেমন ঘৃণ্য, কুৎসিত ও অমানবিক, তেমনি তাদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন না করাও হচ্ছে একটি বর্বরতম অপরাধ। বহিরাগতরা অবশ্যই সরকার কর্তৃক সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসিত হওয়ার হকদার। কিন্তু এ পুনর্বাসন হতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে।

বহিরাগতদেরকে সামরিক উদ্দেশ্যে ও শাসক শোষক গোষ্ঠির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কাজটি যেমন ঘৃণ্য, কুৎসিত ও অমানবিক, তেমনি তাদেরকে যথাযথভাবে পুনর্বাসন না করাও হচ্ছে একটি বর্বরতম অপরাধ। বহিরাগতরা অবশ্যই সরকার কর্তৃক সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসিত হওয়ার হকদার। কিন্তু এ পুনর্বাসন হতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে। কারণ, এক. পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক দশমাংশ হলেও এখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। যার কারণে কাপ্তাই বাঁধের ফলে ৫৪ হাজার একর জমি জলমগ্ন হলে ৬০ হাজার পাহাড়ী ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি পুনর্বাসনের মতো জমি বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকতো তাহলে বছরের পর বছর কেবলমাত্র সরকারী রেশনের ওপর নির্ভর করে বহিরাগতদেরকে থাকতে হতো না। দুই. বহিরাগতরা ইতিমধ্যে পাহাড়ীদের বহু জমিজমা ও বসতবাড়ি বেদখল করে আছে। বেদখলকৃত জমি থেকে বহিরাগতদের না সরিয়ে পাহাড়ীদের নিজেদের জায়গা জমিতে পুনর্বাসন সম্ভব নয়। তিন. বর্তমানে সামরিক অফিসারগণও স্বীকার করছেন যে, বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা ছিল একটি মারাত্মক ভুল। এর সাথে এটা যোগ করা দরকার যে, সময় থাকতে এই ভুল সংশোধন না করাটা হবে একটি জঘন্য অপরাধ। চার. বহিরাগতদেরকে আভ্যন্তরীণ শরণার্থীর মর্যদা দিয়ে পুনর্বাসনের অর্থই হচ্ছে তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি দেয়া, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কখনো মেনে নেবেন না। পাঁচ. বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করার জন্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট অর্থ সাহায্য দিতে রাজী হয়েছে। কাজেই মিল কারখানা স্থাপন করে বা অন্য কোন ভালো পন্থায় তাদেরকে পুনর্বাসন করা কোন সমস্যা হতে পারে না। ছয়. পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ হলেও এর স্বতন্ত্র্যতাকে অবশ্যই মর্যাদা দিতে হবে।

মূলতঃ বহিরাগত হতদরিদ্র মানুষদের পুনর্বাসন না করাটা হচ্ছে রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিজাত। প্রত্যেকটি সরকার তাদেরকে নিজেদের হীনস্বার্থে ব্যবহার করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। আওয়ামী লীগ নেতারা বহিরাগতদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজে লাগানোর সমূহ সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে।

মূলতঃ বহিরাগত হতদরিদ্র মানুষদের পুনর্বাসন না করাটা হচ্ছে রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিজাত। প্রত্যেকটি সরকার তাদেরকে নিজেদের হীনস্বার্থে ব্যবহার করেছে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারও তার ব্যতিক্রম নয়। আওয়ামী লীগ নেতারা বহিরাগতদেরকে ভোট ব্যাংক হিসেবে কাজে লাগানোর সমূহ সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে। বহিরাগতরা যে সরকারী রেশনের ওপর নির্ভরশীল সেটাকেই ভোট আদায়ের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করবে আওয়ামী লীগ সরকার, যেমনভাবে অতীতের সরকারসমূহ করে এসেছে। এ কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসিত হতে খোদ বহিরাগতদের আপত্তি না থাকলেও আওয়ামী লীগ নেতারা তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করতে আগ্রহী নয়।

সরকার ও জেএসএস সম্পাদিত চুক্তিতে বহিরাগতদের ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ না করে সমস্যার জট আরো বেশী পাকানো হয়েছে। এই উল্লেখ না থাকাটাও প্রতারণামূলক ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ কথা জেএসএস ও সরকার উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বহিরাগতদের ভবিষ্যৎ কি হবে সে সম্পর্কে চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার ছিল। তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি স্পর্শকাতর বলে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়ার ফলে সমস্যা কেবল জটিলই হয়েছে। এ জন্য জনসংহতি সমিতিও দায় এড়াতে পারে না।

আমরা চাই, দারিদ্র্য ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে বহিরাগতদেরকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার অচিরেই বন্ধ করা হোক, এবং তাদেরকে সম্মানজনকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন করা হোক। এটা কঠিন কোন কাজ নয়। এর জন্য কেবল দরকার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও সদিচ্ছা।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্তি চাই

মহান শিক্ষাদিবস উপলক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকায় এক সেমিনার আয়োজন করে। সেখানে পরিষদের পক্ষে পঠিত মূল প্রবন্ধটি এখানে হুবহু প্রকাশ করা হল। -সম্পাদক

মহান শিক্ষা দিবস উপলক্ষে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ "জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তভূক্তির" দাবি নিয়ে আজকের এই আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। গৎবাঁধা আচারসর্বস্ব আলোচনা সভা, সেমিনার ও অনুষ্ঠানের বিপরীতে আজকের এই আলোচনা সভার শিরোনাম, উপস্থাপিত দাবিনামা ও বক্তব্য নিঃসন্দেহে দেশের বিদগ্ধমহল, ছাত্র সমাজ ও তথা জনমনে নতুন করে চিন্তার খোরাক যোগাবে। আমরা আমাদের উথাপিত দাবি ও বক্তব্যের আলোকে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মতামত ও বক্তব্য প্রত্যাশা করি।

"জাতীয় শিক্ষানীতির" মতো এত বড় জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশে আজো যে সর্বজনগ্রাহ্য একটা নীতি প্রণীত হলো না, এটা রীতিমতো গা শিউরে উঠার মতো ব্যাপার। সার্বজনীন বিজ্ঞানভিত্তিক সেক্যুলার শিক্ষানীতি প্রবর্তিত না হবার ভয়ানক পরিণতি হচ্ছে বর্তমানের "শিক্ষাঙ্গন" এবং "শিক্ষার মান"। এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে যাওয়া, মা'র কাছে মামার বাড়ীর গল্প করার মতোই শোনাবে।

'শিক্ষার মাধ্যম' নিয়ে আমাদের যে কথা বলার ও দাবি উথাপন করার রয়েছে তা হচ্ছে, 'প্রাইমারী লেভেলে' মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া। এটা প্রথম প্রথম হয়তো অনেকের বোধগম্য নাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এটাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ' জাতিসত্তাসমূহের ভাষার' সাথে বাংলার কোন মিল নেই।

দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা না করে আমরা আজকের আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে ফিরে আসতে চাই। এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো যৎকিঞ্চিত আলোচনায় নিয়ে আসা হবে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দেশে বর্তমান আওয়ামী লীগের শাসনকাল পর্যন্ত পাঁচটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে এবং সুপারিশমালাও পেশ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই কমিশনসমূহের পেশকৃত সুপারিশমালা তথা শিক্ষানীতি ছাত্র সমাজ তথা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি।

পাকিস্তানের শাসনামলে ৫৯ সালের শরীফ কমিশন, ৬৬ সালের জাস্টিস হামিদুর রহমান কমিশন ও ৬৯ সালের অন্তবর্তীকালীন নূর খাঁ কমিশনের প্রণীত শিক্ষানীতি ও সুপারিশমালাই সামান্য এদিক-সেদিক করে স্বাধীনতাত্তোর কালে গঠিত শিক্ষা কমিশনগুলো নতুন মোড়কে পুরাতন পরিত্যক্ত জিনিষ পরিবেশন করতে চেয়েছে। স্বভাবতই পাকিস্তান আমলে যেমন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে, তেমনি দেশ স্বাধীন হবার পরেও স্বাধীন দেশের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে। এমন কি প্রাণ দিতে হয়েছে। ৮৩ সালে প্রণীত ড: মজিদ খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল তা ছাত্র আন্দোলনে এক বিরাট অধ্যায় হয়ে রয়েছে।

শিক্ষানীতি বিষয়ে অনেক কিছু আলোচনায় থাকলেও আমরা মোটা দাগে চারটি ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত পেশ করতে চাই।

১. শিক্ষার মাধ্যম
২. শিক্ষার পদ্ধতি বা ধরণ
৩. পাঠ্যসূচী
৪. শিক্ষার স্তর

পাঠ্যসূচীতে দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। পাঠ্যসূচীতে এসব না থাকার কারণে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ব্যাপারে এদেশে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এগুলোর অবসান হওয়া উচিত।

১. শিক্ষার মাধ্যম:

'৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর থেকেই এদেশে সবক্ষেত্রেই বাংলা চালু করণের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিলো। বিশেষত: স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছে। এটি যতটা না বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত বা উন্নত করার প্রচেষ্টা, তার চাইতে বেশী হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। ক্ষমতাসীন দল তথা শাসকগোষ্ঠীগুলোর এই ' বাংলা প্রীতির' আসল মতলব কারোর অজানা কোন বিষয় নয়।

আপত্তির জায়গাটা হচ্ছে এটাই যে, শাসকগোষ্ঠীদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থের বলি হতে হচ্ছে গোটা ছাত্র-সমাজকে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান যে দশা এবং তা নিয়ে যে এত অসন্তোষ ও বিতর্ক -এসব শাসকগোষ্ঠীদের সংকীর্ণ ও ভ্রান্তপদক্ষেপ থেকেই উদ্ভুত। সে বিষয়ে এখানে আমাদের তত বেশী আলোচনা না করলেও চলে। উপস্থিত বিদগ্ধ আলোচকবৃন্দ সেই বিষয়গুলো চমৎকারভাবে আলোচনা করবেন।

'শিক্ষার মাধ্যম' নিয়ে আমাদের যে কথা বলার ও দাবি উথাপন করার রয়েছে তা হচ্ছে, 'প্রাইমারী লেভেলে' মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া। এটা প্রথম প্রথম হয়তো অনেকের বোধগম্য নাও হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এটাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ' জাতিসত্তাসমূহের ভাষার' সাথে বাংলার কোন মিল নেই। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের Microscopic Minority -দের মধ্যে খুমি, খিয়াং সহ বেশীরভাগ জাতিসত্তাইশিক্ষাদীক্ষায় আতঙ্কজনক রকামের পিছিয়ে রয়েছে। এর প্রধানতম কারণই হচ্ছে ভাষাগত। এই বাস্তব সত্য অনুধাবন করেই ব্রিটিশ শাসনামলে রাঙ্গামাটি হাই স্কুলের ইংরেজ প্রধান শিক্ষক মিলার প্রাথমিক লেভেলে শিশুদের পড়ানোর জন্য বই লিখেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তা সমূহকে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর করতে গেলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান যে বাস্তব ও অপরিহার্য তা মিলার সাহেবের মতো এক দূরদর্শী ইংরেজ ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু মিলার সাহেবের এই যুগান্তকারী মহৎ উদ্যোগ সফল হতে পারেনি। এটা সবচেয়ে দুঃখজনক। যে সময়ে মিলার ঐ মহৎ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সে সময় পাহাড়ীদের বিশেষত: তৎকালীন চাকমা নেতৃবৃন্দের সাথে ইংরেজ শাসকদের সম্পর্ক এতো ভাল ছিল না। তারা এটাকে ইংরেজ মিশনারীদের ধর্মান্তরকরণের সুক্ষ্ম প্রচেষ্টা হিসাবে দেখেছিলেন। যাই হোক, বিষয়টা আরো অধ্যয়ন এবং গবেষণার দাবি রাখে।

তবে, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে পাহাড়ী জাতিসত্তাসমূহকে শিক্ষায় আলোকিত করার উপকলব্ধি মিলার সাহেবের গভীর দূরদৃষ্টি প্রমাণ করে। বতৃমান সময়ে মিলার সাহেবের মতো মহৎ ও দূরদর্শী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আজ আমাদেরকে দাবি উথাপন করতে হচ্ছে।

শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম বেলায়ই নয়, ময়মনসিংহ, সিলেট, কক্সবাজার ও উত্তরবঙ্গ যেখানে সংখ্যালঘু জাতিসত্তারা রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই অস্বীকার করবে না। উন্নত পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়ণের ক্ষেত্রে বাংলার সীমাবদ্ধতার কথা কারোরই অজানা নয়। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা তো মাতৃভাষাই হতে হবে। একজন শিশু মা'র কাছ থেকে যেভাবে প্রকৃতি-পরিবেশ, সমাজ, সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিষয়ে প্রাথমিকভাবে 'ধারণা' পায়, তেমনিভাবে প্রাইমারী স্কুলেও সহজ-সাবলীলভাবে স্বাস্থ্যবিধি, নিজের সমাজ রূপকথা-গল্পগাঁথা ইত্যাদি জানবে। তাহলেই শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব।

২. শিক্ষার পদ্ধতি ও ধরণ: দেশে একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্ডারগার্টেন, ক্যাডেট কলেজ, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা এ ধরণের বৈষম্যমূলক শিক্ষার অবসান ঘটিয়ে সার্বজনীন বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ দাবী জানায়।

৩. পাঠ্যসূচী: পাঠ্যসূচীতে দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তি থাকতে হবে। পাঠ্যসূচীতে এসব না থাকার কারণে ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কোন পথে?

মেঘনা গুহঠাকুরতা

তথাকথিত শান্তিচুক্তির পর বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের ব্যাপারে কথাবার্তা বেশ জোরে শোরে শোনা যাচ্ছে। সরকার, বিদেশী সংস্থা, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিও সমূহ এ ব্যাপারে বেশ সোচ্চার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের চেয়ারম্যান মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রশ্ন রেখেছেন, "সবুজ পাহাড় ঘেরা কাপ্তাই বাঁধের উত্তাল ঢেউবেষ্টিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দশাও কি বাংলাদেশের মতো 'Test Case of Development থেকে আন্তর্জাতিক Basket-case হতে যাচ্ছে?" -সম্পাদক

দু বছর পার হল পার্বত্য চট্টগ্রামে 'শান্তি-চুক্তি' সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নকে নিয়ে বাঙালী রাজনীতিবিদদের চিন্তাভাবনা প্রায় তারস্বরেই শোন যাচ্ছে। পাত্র বিশেষে ভিন্নতা দেখা দিলেও চিন্তারধারা প্রায় একই: "এই সুবর্ণ সুযোগ, একটি পশ্চাৎপদ অঞ্চলকে আধুনিকতার স্পর্শে দীক্ষিত করার। তাই উন্নয়ন হবে রাস্তাঘাট তৈরিতে, রাবার প্লান্টেশন কিংবা বনায়নে, আর পাহাড়ের কোলে লালিত তেল ও গ্যাস সম্পদ উত্তোলনে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগে এবং পর্যটন ব্যবসার প্রসারতায়"।

কিন্তু এ ধরনের উন্নয়ন নীতি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা উচ্চকিত ও উৎকণ্ঠিত। কেননা ইতিহাস তাদের শিখিয়েছে সতর্ক হতে সেই উন্নয়নধারা সম্পর্কে যা কিনা এলাকাবাসীর ভালোমন্দ বা যুক্তি-পরামর্শ বিচার-বিবেচনা না করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা চাপিয়ে দেয়া হয়। তিরিশ বছর আগে কাপ্তাই বাঁধের নির্মাণ প্রায় এক লাখ জুম্ম জনগণকে তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। অপরদিকে গত দুদশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছে শান্তিবাহিনী দমন করার নামে সেনাবাহিনীর অপারেশনের জন্য, তা পার্বত্য গ্রামবাসীদের মনে সঞ্চয় করেছে ভীতি ও সন্ত্রাস। তাছাড়া সেগুলো দিয়ে সম্ভব হয়েছে পাহাড়ি এলাকায় বনজ সম্পদ লুণ্ঠনের বেআইনি কার্যক্রম। সরকার পরিচালিত বনায়ন কর্মসূচিও পাহাড়িদের জন্য বয়ে নিয়ে এসেছে দু:খ-দুর্দশা; কেননা যেখানে বনায়ন কর্মসূচি হয়েছে সেখানে হাজার হাজার জুম্ম জনগণ উৎখাত হয়েছে তাদের জমি ও বসতভিটা থেকে। অতীতের ভুলত্রুটিই তাই জুম্ম জনগণকে শিখিয়েছে রাষ্ট্র পরিচালিত উন্নয়ন নীতির প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করতে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা না উল্লেখ করে পারছি না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশে প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক রেহমান সোবাহান একটি গবেষণা প্রকল্পের আলোচনাকালে ঘটনাটির উল্লেখ করেন। ১৯৭৫ সালে মুজিব সরকার পতনের কিছুদিন আগে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা, তৎকালীন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে একটি খসড়া ব্লু প্রিন্ট অধ্যাপক রেহমান সোবহানের কাছে নিয়ে আসেন। এই উন্নয়ন ব্লু প্রিন্ট লারমা তৈরি করেছিলেন পার্বত্য এলাকাবাসীর পরিবেশ, প্রকৃতি ও নিজস্ব কৃষ্টিকে মনে রেখে। কিন্তু এই খসড়া কাগজ জমা দেয়ার পরপরই তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অপর একটি খসড়া পরিকল্পনার কাগজ জমা দেন যেখানে পার্বত্য এলাকাকে একটি নিরাপত্তা জোন হিসেবে তৈরি করার কথা বলা হয়। নিরাপত্তার কথা এখানে যদিও ভারতীয় সীমান্তকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল তবে এটি মনে রাখা দরকার যে, তখন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ বাঙালি আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছিল। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, অতীত থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে দু'রকমের ভাবনা-চিন্তা চালু হয়েছে। প্রথমটি একটি নিরাপত্তা জোন হিসেবে উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন। অপরটি পাহাড়ি এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও চাহিদাকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন চিন্তার পয়োজন। বলাই বাহুল্য, মূল ধারার রাজনীতিতে শেষেরটির চেয়ে প্রথমটির প্রতিফলন বেশি দেখতে পাই।

বর্তমান চুক্তি-উত্তর পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়নের সমস্যা চিহ্নিত করতে গেলে অর্থনৈতিক প্রশ্নসহ রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়- যে রাজনৈতিক সমাধান চুক্তি দ্বারা মীমাংসিত হয়নি কিংবা বলা চলে যে রাজনীতি চুক্তি সই করার মাধ্যমে টিকে আছে। এই চুক্তির মধ্যে জুম্ম জনগণকে কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। তাছাড়া 'যৌথ ভূমি'র ধারণাটিও অস্পষ্ট থেকে গেছে ফলে অনেক পাহাড়ির জমি সেনাবাহিনী, সমতলভূমির বাঙালি, বনায়ন প্রকল্প এমনকি অন্য পাহাড়িদের দ্বারা দখলকৃত হয়েছে যার মীমাংসা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া যে সকল বাঙালিকে সরকার সমভূমি থেকে নিয়ে এসে পার্বত্য এলাকায় বসবাস করার উৎসাহ যুগিয়েছে, তাদের নিয়ে কী করবে সরকার তার কোনও দিকনির্দেশনা দেয়নি এই চুক্তিতে। জুম্ম জনগণ মনে করেন যে, এই সকল মৌলিক সমস্যা যতদিন না মিটবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত উন্নয়নের কথা বলা বৃথা।

চুক্তি-উত্তর পরিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অনেকে মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা অনেকটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের মতোই- একই সঙ্গে বিস্ফোরণোন্মুখ ও পরিবর্তনশীল। এ ব্যাপারে দুজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হল।

বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও এককালীন ILO-র একটি প্রকল্পের Founder co-ordinator ড. আনিসুর রহমান তুলনাটা এরূপ করেন: সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্য ছিল স্বনির্ভরতা অর্জন কিন্তু তা ব্যর্থ হল কেননা বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য ও দান স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার রুখে দাঁড়াতে পারেনি। ফলে একটি পরনির্ভরশীল উন্নয়নধারা প্রবর্তন হল। তিনি মনে করেন যে, জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ যতি এ ব্যাপারে সতর্ক না থাকে তাহলে তারা একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। তবে তিনি মনে করেন যে, জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দের অনেকের মধ্যেই এখনও আদর্শবাদ কাজ করে যেহেতু তারা একটা দীর্ঘ সংগ্রাম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসেছেন। তবে কতদিন তারা দাতাগোষ্ঠীর আকর্ষণকে প্রতিহত করতে পারবেন সে নিয়ে সন্দেহ জাগা অমূলক নয়। তবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সকল উন্নয়ন চিন্তাই নেতিবাচক ছিল না, পরনির্ভরশীল ছিল না। তখন বেশ কয়েকটি স্থানীয় উদ্যোগ চিহ্নিত করা যায়- যেগুলো স্থানীয় বা গ্রামীণ সম্পদ সঞ্চালন করার পেছনে কাজ করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এই ধরনের প্রচেষ্টাকে হয় স্বীকৃতি দেয়নি না হয় দমন করার চেষ্টা করেছে। এই সকল উদ্যোগকে প্রথম দমন করা হয় ১৯৭৪ -এর দুর্ভিক্ষের সময় এবং পরবর্তীতে সামরিক শাসনের সময়কালে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারায় যেটা লক্ষ করা যায়- এই উদ্যোগের স্থলে জন্ম নিয়েছে ঋণদান সংস্থা। ক্রমেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলো প্রান্তিক হয়ে পড়ে।

অপর একজন অর্থনীতিবিদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আনু মোহাম্মদ চুক্তি-উত্তর পরিবেশের এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে, এরশাদ সরকারের সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে একটি ধনীক শ্রেণী গড়ে ওঠে, যারা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছে সেনাবাহিনী ও আমলাতন্ত্র থেকে। সংগ্রামের সময় জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ এদের বিরোধিতা করে। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষর করার পরবর্তীতে এরা এই ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে জোট তৈরি করার চেষ্টা করছে। সুতরাং দেখা যায় যে, পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে একটি শ্রেণী তাদের আসন পাকাপোক্ত করতে ব্যস্ত- যাতে করে তারা ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে, যা কিনা এ অব্দি সেনাবাহিনী দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। তবে আনু মোহাম্মদ এটাও বলেন যে, যেহেতু সেনাবাহিনীর উপস্থিতি এই এলাকায় অব্যাহত রয়েছে এবং তাদের স্বার্থও অটল রয়েছে এটা ভাবা দুরূহ যে, তারা চট করে সিভিল সমাজের ওপর সব নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করবে, তারা হোক বাঙালি, হোক পাহাড়ী। তাদের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে উত্তম পথ হবে এই ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে জোট তৈরি করা। আনু মোহাম্মদ আরও বলেন যে, তিনিও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সঙ্গে এই পরিস্থিতির কিছু সাদৃশ্য দেখছেন। যেমন করে ঋণদান সংস্থাগুলো আধিপত্য বিস্তার করেছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের ভাবধারায় তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামেও তাদের একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করতে তারা আকুল। আনু মোহাম্মদের মতে, তাই উন্নয়ন কর্মকান্ডের ছত্রছায়ায় যা চলছে তা হচ্ছে মধ্যবিত্তের প্রসার।

উপরিউক্ত ধারাবাহিকতাকে জটিল করছে দাতাগোষ্ঠীর পদচারণা। দীর্ঘ দুই দশক ধরে বিদেশীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এই অঞ্চল। ফলে হাতেগোনা মুষ্টিমেয় বিদেশী সংস্থা বাদে সমভূমির তুলনায় এই অঞ্চলে এনজিও ও বিদেশী সংস্থার কর্মকান্ড ছিল অতি নগণ্য। এখন বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো প্রবেশ করছে দেশী-বিদেশী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার কর্মীবৃন্দ। তবে প্রশ্ন হল কার মঙ্গলের জন্য। শোনা গেছে যে, পাক-ভারত পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর একটি বিশেষ ইউরোপীয় দেশ তাদের বিনিয়োগের টাকা ঐ অঞ্চল থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে ধেয়ে চলছে। মূল উদ্দেশ্য তাদের টাকা লগ্নি করা। এলাকাবাসীর এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতি কম। তাদের চিন্তাভাবনা করারও ফুরসত দেয়া হচ্ছে না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাও এখন নেই যারা একটি খসড়া ব্লু প্রিন্ট দাঁড় করিয়ে জোরগলায় বলতে পারবে যে, আমরা এ ধরনের উন্নয়ন চাই! কিছু দিন আগে রাঙ্গামাটি ডিকলারেশন বলে একটি ঘোষণাপত্র বের হয়েছে একটি সেমিনারের ফসল হিসেবে যেখানে কিছু উন্নয়ন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে বটে কিন্তু দাতাগোষ্ঠীর অনেক রিপোর্টের মতো সেটাও রাজনীতি বিবর্জিত। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রমাণ করে, যে উন্নয়নধারাকে দেশের রাজনৈতিক জনমত সমর্থন করে না, সেই উন্নয়ন ধারার মৃত্যু অনিবার্য! স্বাধীন বাংলাদেশকে 'Test Case of Development' থেকে আন্তর্জাতিক 'Basket-case'-এ পরিণত হতে হয়েছিল। সবুজ পাহাড় ঘেরা কাপ্তাই বাঁধের উত্তাল ঢেউবেষ্টিত পার্বত্য চট্টগ্রামের দশাও তাই হতে যাচ্ছে? ৯/২/২০০০

সৌজন্যে দৈনিক যুগান্তর

জেএসএস -এর ভ্রান্ত রাজনীতি সম্পর্কে কিছু কথা

মি. লোটাস

পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ দুই যুগ আন্দোলন চলার সময়ে একদিকে সেনাবাহিনী 'জ্বালাও পোড়াও নীতির' ভিত্তিতে দমন-পীড়ন-হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে পাহাড়ী জনপদকে শ্মশানে পরিণত করেছে। অসংখ্য লোককে মারধোর করে পঙ্গু-অর্ধপঙ্গু বানিয়ে তাদের জীবন অর্থহীন করেছে। সেনাবাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনের যারা শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে আমি নিজে একজন। সেনাবাহিনীর নির্যাতন ও বর্বরতার কথা কোন পাহাড়ীর পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

অন্যদিকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের কথা বলে শান্তিবাহিনী আন্দোলনের নামে যা করেছে, তার বেশীর ভাগই ছিলো হঠকারী ও ভ্রান্ত। পরিণামে তাদেরকে আন্দোলন বাদ দিয়ে সরকারের কাছে নির্লজ্জভাবে সারেন্ডার করতে হয়েছে। আঞ্চলিক পরিষদ গ্রহণ করে তারা এখন সরকারের পোষমানা প্রাণীর মতো হয়ে আছে।

জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর ভ্রান্ত নীতিগুলোর মধ্যে বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের কথাটি সর্বাগ্রে বলা দরকার। তাদের ভ্রান্ত ও হঠকারী নীতির কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে এত বেআইনী বহিরাগত (আনুমানিক ৪ লক্ষ) পুনর্বাসিত হতে পেরেছে। সরকার যখন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সমতল থেকে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে পুনর্বাসন করতে থাকে, তখন জনসংহতি সমিতি এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদই করেনি। সাধারণ জনগণ সরকারের ধ্বংসাত্মক নীতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতিবাদ করলে, জনসংহতি সমিতি বা শান্তিবাহিনীর অনেক বড় বড় নেতা বলেছিলো 'বাঙালী মুসলমানরা (তাদের বহুল ব্যবহৃত ভাষা) আসুক। লুই'য়ের কোণায় (মাছ ধরার সরঞ্জাম) ঢুকে পড়ুক'। এর পরিণাম যে কত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তার ভুক্তভোগী একমাত্র সাধারণ পাহাড়ীরাই জানে। সরকার বহিরাগতদের পুনর্বাসন সম্পন্ন করে ফেলার পরই শান্তিবাহিনীর হুঁশ হয়। বহিরাগতদের তারা হামলা শুরু করে।

মতামত

এর ফল হয় হিতে বিপরীত। শান্তিবাহিনীর হামলায় যতজন বহিরাগত বাঙালী না মারা পড়ে, তার পাল্টা হিসেবে বহিরাগতরা সেনাবাহিনীর সহায়তায় শতগুণ পাহাড়ীদের খুন ও ক্ষতিগ্রস্থ করে। এসব ক্ষয় ক্ষতির হিসেব সরকারীভাবে কোনদিনই দেয়া হয়নি।

জনসংহতি সমিতির ভ্রান্ত নীতির মধ্যে আরো একটা বিষয় যা সবচেয়ে আপত্তিজনক তা হচ্ছে, খুন খারাপি করা। সেনাবাহিনীর উপর তারা যতটা না হামলা চালাতে পেরেছে, তার চাইতে বেশী সাধারণ নিরীহ জনগণের উপর আক্রমণ চালিয়েছে। তাদের মধ্যে আসলে গণতান্ত্রিক মানসিকতা বলে কিছু নেই। নিজেদের দলে যাদের টানতে পারবে না, তাদেরকে খুন করাই জনসংহতি সমিতির একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের আদর্শ কর্মসূচী প্রচার করে কর্মি টানার উদ্যোগ তাদের মধ্যে দেখা যায় না।

আত্মসমর্পনের পর পরই জনসংহতি সমিতি হত্যাকান্ড শুরু করে দেয়। জনসংহতি সমিতির বিচ্যুতি ও অধঃপতনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা না করায়, পানছড়িতে উদীয়মান তরুণ নেতা ইউপি চেয়ারম্যান কুসুম প্রিয় চাকমা ও প্রদীপ লাল চাকমা ১৯৯৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল দিনে দুপুরে রাজপথে জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীদের হাতে খুন হন। তারপর খুন-খারাপিই হয়ে দাঁড়ায় তাদের একমাত্র কর্মসূচী। মাইসছড়ির হরেন্দ্র-হুরুক্যা, দীঘিনালার আনন্দ-মৃণাল-সরোজ কার্বারীসহ এ পর্যন্ত বিশজনের মতো লোককে তারা হত্যা করেছে। খুনী বার বারই খুন করতে চায়। খুন করাই তাদের নেশা হয়ে দাঁড়ায়।

সারেন্ডারের পূর্বেও তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বহু পাহাড়ীকে খুন করেছে। এই খুনের তালিকা বড় বই ছোট হবে না। আমি পরিচিতের মধ্যে কয়েকজনের নাম করতে পারি। এর মধ্যে পেরাছড়ার স্কুল শিক্ষক পারুল বাবু ও তার আপন ভাই, মহাজন পাড়ার অরুণ বাবু ও উদীয়মান যুবনেতা বিনয় চাকমা, খবঙপুজ্যার মাঝবয়সী একনিষ্ঠ কর্মি ভালা ও যুবক নাহবো। প্রতিটি এলাকায় খোঁজ নিলে এ ধরনের অসংখ্য নাম পাওয়া যাবে।

জনসংহতি সমিতির বা শান্তিবাহিনীর এতসব ভ্রান্তনীতি ও হঠকারীতাকে ক্ষমা করে দেয়া যেতো, যদি তাদের 'পার্বত্য চুক্তির' মাধ্যমে দুর্ভাগা জনগণের অধিকার অর্জিত হতো। আন্দোলন করে তারা জনগণের জন্য তো উল্লেখযোগ্য কিছু সাধন করতে পারেনি, বরং জনগণের অহিতকর কাজে তারা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। এখানেই জনগণের সবচেয়ে আপত্তি।

জনসংহতি সমিতির সাধের 'পার্বত্য চুক্তি' কি ফল দিচ্ছে, তা দুই আড়াই বছরে প্রমাণ পাওয়া গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আর মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির বলি হতে প্রস্তুত নয়। জনসংহতি সমিতির উপর নির্ভর করতে গিয়ে জনগণকে সর্বশান্ত হতে হলো। 'শান্তিচুক্তি' বিষয়ে জনসংহতি সমিতির নেতারা নিজেরাই হতাশ, আবার কোন অধিকারে তারা চুক্তি মানার জন্য জনগণের উপর জোর জবরদস্তি করতে চায়? অর্থ-চাকুরী-নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে পিসিপি-পিজিপি ও এইচ.ডব্লিউ.এফ. হতে বিচ্যুতদের কুড়িয়ে নিয়ে জল ঘোলা করা গেলেও, তাতে জনগণের অধিকার অর্জিত হবে না। উঠতি যুবশক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করে জনগণের সমর্থন পাওয়া যাবে না। যুব সমাজের ভবিষ্যত শেষ করে, সমাজে বিশৃংখলা ঘটিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতারা কার উদ্দেশ্য সাধন করতে নেমেছে?

আপনাদের উদ্দেশ্যে আমার আহ্বান, সরকারের কাছ থেকে যা সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন তা নিয়ে থাকুন। জনগণের অধিকার আদায়ের পথে বাধ সাধতে যাবেন না, প্রতিবন্ধক হবেন না। ❑

গ্রন্থ সমালোচনা

পাহাড়ের রুদ্ধকণ্ঠ: পাহাড়ি নারীদের নিপীড়ন ও প্রতিরোধ

হিল উইমেন্স ফেডারেশন
প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর, ১৯৯৯
পৃষ্ঠা: ৭২+ছবি, মূল্য: ৭৫ টাকা (US $ 7)

"পাহাড়ের রুদ্ধকণ্ঠ: পাহাড়ি নারীদের নিপীড়ন ও প্রতিরোধ" হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রথম প্রকাশনা। বইটির বিষয়বস্তুর মধ্যে ভিন্ন মাত্রা ও নতুনত্ব রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের স্বাধিকার আন্দোলন নিয়ে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এসব বইয়ে যে বিষয়টি কোন দিনই আলোচনায় স্থান পায়নি সে বিষয় নিয়েই এ বই। নামের মধ্যেই প্রকাশ পায় বইটির প্রসঙ্গ কি। এক ঝাঁক তরুণ লেখিকা তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন সহজ-সরল সাবলীল ভাষায়। তাদের লেখার মধ্যে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন সময়ের ঘটনা, সেনাবাহিনীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষ বর্ণনা, আর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নেয়া জুম্ম শরণার্থীদের দু:খ দুর্দশার করুণ কাহিনী। বইটিতে ১৭টি ছোট বড় প্রবন্ধ রয়েছে। কবিতা ৩টি এবং ত্রিপুরা, মারমা ও চাকমা গান (বাংলা অনুবাদ সহ) রয়েছে মোট ৯টি। এছাড়াও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনের ১৬টি বিরল ছবি রয়েছে।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধই হচ্ছে এক একটি ঘটনার বর্ণনা। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। আর যেহেতু লেখকরা সকলেই নবীন, তাই তাদের লেখায় যে ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার অধিকাংশই ঘটেছে ৮০ দশকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে। এ সময় সেনাবাহিনী ও সেটলারদের সন্মিলিত অত্যাচার নিপীড়ন, হত্যা, হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মাত্রা ছিল অত্যধিক, অকল্পনীয়। লেখাগুলিতে ঘটনার কোন বিশ্লেষণ নেই, শুধু মাত্র কিশোর বয়সে দেখা ঘটনার বর্ণনা ও অনুভূতি ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়া তাদের লেখায় ফুটে উঠেছে কিভাবে সেই সব ঘটনা তাদের মনে ক্রিয়া করেছে এবং পরবর্তীতে অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শিখিয়েছে।

বইয়ে কিছু গান ও কবিতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে বইয়ের সম্পাদক মন্ডলী ভূমিকায় লিখেছে, '... সত্তর দশকে জনপ্রিয় সে সময়কালের যুব মানসের প্রতিফলন ঘটানো কিছু গানও সংকলনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে'। যদিও সেই গান ও কবিতাগুলো ৭০ দশকে রচিত হয়েছিলো কিন্তু আজো সেই গানের আবেদন ফুরিয়ে যায়নি।

১৯৯৬ সালের জুন মাসে কতিপয় চিহ্নিত সেনা ও ভিডিপি সদস্য দ্বারা অপহৃত হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার ডাইরী থেকে ছাত্র ও যুব আন্দোলন প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি সংকলনটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিভিন্ন সমাবেশে দেয়া তার দু'টি বক্তব্য এবং অপহৃত হওয়ার কিছু দিন পূর্বে নারী অধিকার বিষয়ে লেখা তার প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। যা এখন ইতিহাসেরই অংশ।

বইটিতে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৬টি দুর্লভ ছবি ছাপা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধিকার আন্দোলনে নারী সমাজও যে গর্বিত অংশীদার ছবিগুলোতে তার প্রমাণ মিলে ।

বইটি বস্তুত একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশনা। ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে 'আওয়ামী লীগ- জনসংহতি সমিতি' মার্কা চুক্তির পর 'শান্তি', 'সমাধান' নামে শাসকগোষ্ঠির প্রচার মাধ্যম যে বাড়াবাড়ি প্রচারণা শুরু করেছিলো তার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে পাহাড়ের রুদ্ধকণ্ঠ পাহাড়ি নারীদের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা নিয়ে পাঠকের কাছে হাজির হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক মেঘনা গুহঠাকুরতা বইটির মুখবন্ধটি রচনা করেছেন। তিনি বইটিতে উল্লেখিত ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, '... শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয় ২৬ বছর পর। কিন্তু সেই যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ হত্যার শিকার হয়েছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের মাধ্যমে যে সকল নারী নির্যাতিত হয়েছে তার কোন স্বীকৃতি নেই। এ সকলই উপস্থাপিত হয় একটা 'ভুল' হিসেবে। অতীত স্মৃতি ইতিহাসে পরিণত হয় না। বরং তাকে ঠেলে দেয়া হয় অমানিশার ঘোর আঁধারে'। তিনি এ বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধের ভয়াবহতা, তীব্রতা। যদিও আক্ষরিক অর্থে সে রকম লক্ষ লক্ষ প্রাণ হানি ঘটেনি।

- সৈকত দেওয়ান, ১৬.২.২০০০।

ADHIKAR (RIGHTS)

English verson
CHT Bulletin News Letter No.-1
November, 1999
Jumma People's Network-Japan
Pages-24

জাপানে 'অধিকার' নামে একটি নিউজ বুলেটিন জাপানি ও ইংরেজী ভাষায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। জাপানে অবস্থানরত জুম্মদের উদ্যোগে 'জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক-জাপান' নামে একটি প্রচার সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনটির উদ্যোগেই এটি প্রকাশিত হচ্ছে। 'অধিকার'-এর মাধ্যমে সংগঠনটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাবলীসহ চুক্তির অসারতা তুলে ধরছে। গত বছর নভেম্বরে প্রথম বুলেটিনটি প্রকাশিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার রিপোর্ট, মানবাধিকার লংঘন, ইউপিডিএফ-এর প্রাথমিক ঘোষণা পত্র, বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রমের বর্ণনা ও টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে জুম্মদের বিক্ষোভের সংবাদ ছবি সহ তুলে ধরা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রচারের ক্ষেত্রে এটি বিরাট ভূমিকা রাখতে পারবে। অতি শ্রীঘ্রই বুলেটিনের ২ নং ইস্যুটি বের হবে বলে জানা গেছে।

- সৈকত দেওয়ান, ১৭.২.২০০০।

স্ফুরণ

(স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের একটি প্রকাশনা)
পৃষ্ঠা: ১২, দাম: ৫ টাকা

মূলত কিছু উৎসাহী সৃজনপ্রয়াসী ছাত্র- ছাত্রীর উদ্যোগে 'স্ফুরণ' নামক লিটল ম্যাগাজিন অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত তিনটি সংখ্যা বের হয়েছে। সর্বশেষ সংখ্যাটি বেরিয়েছে ফেব্রুয়ারি, ২০০০-এ। ম্যাগাজিনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'সব ধরণের লেখা ছাপা হবে। লেখার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেয়া হবে। সময়োপযোগী লেখা সমূহের মান প্রত্যাশানুরূপ না হলেও প্রয়োজনীয় সম্পাদনা সাপেক্ষে ছাপা হবে। পাহাড়ী জাতিসত্তা সমূহের ভাষায় (যেমন: চাঙমা, মারমা, ত্রিপুরা ...) বাংলা অনুবাদসহ লেখা পাঠানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে'। এতেই বুঝা যায়, স্ফুরণ ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও জাতিসত্তাসমূহের ভাষা চর্চার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে জাতিসত্তাসমূহের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার যে দাবি উঠেছে, এ প্রচেষ্টা তার সাথে সংগতিপূর্ণ। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তিনটি সংখ্যায় অধিকাংশ লেখা বাংলায় প্রকাশিত হলেও মারমা ভাষায় বাংলা অনুবাদসহ গান, চাঙমা ভাষা চর্চার জন্য গঠিত সাহিত্য কেন্দ্র চাঙমা ভাষায় বিজ্ঞাপন ছেপেছে। এছাড়াও স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা ও বর্তমান পরিস্থিতি কি চোখে দেখে, স্ফুরণে প্রকাশিত লেখায় তার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। এ উদ্যোগ চালিয়ে যেতে পারলে স্কুল কলেজ পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের উপকারে আসবে। তরুণ ও নবীন লিখিয়েদের হাতেখড়ি হতে পারে স্ফুরণ। লিটল ম্যাগাজিনটি সংগ্রহ ও লেখা পাঠিয়ে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যোগাযোগের ঠিকানা: সম্পাদক স্ফুরণ, ৪৫১, আহসানউল্লাহ হল, বুয়েট, ঢাকা-১০০০।

- সৈকত দেওয়ান, ২২/২/২০০০

কাপ্তাই হ্রদ এলাকার চাষীরা হর্টিকালচার বোর্ডের প্রতারণার শিকার

-প্রবীর চাকমা, নান্যাচর

হর্টিকালচার বোর্ডের প্রতারণার শিকার কাপ্তাই হ্রদ এলাকার হাজার হাজার বাগান চাষী। ১৯৮০/৮১ সালের দিকে হ্রদ এলাকার চাষীদের জন্য হর্টিকালচার বোর্ড থেকে বাগান চাষের জন্য অর্থ, চারা, সার ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়। সে সময় বোর্ডের কর্মিরা অর্থাৎ মৌজা সহকারীরা (বর্তমানে কৃষি বিভাগের ব্লক সুপারভাইজার) চাষীদের কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, বোর্ড তাদেরকে যে সাহায্য দিচ্ছে তার বিনিময়ে বোর্ড তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের ফলের চারা (যেমন: আম, জাম, আনারস, পেয়ারা, কলা, লেবু) নেবে। কিন্তু বোর্ড এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি বলে বাগান চাষীরা জানিয়েছেন। এমনকি বোর্ড থেকে এ ব্যাপারে কোন খোঁজ খবর পর্যন্ত নেয়া হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে হঠাৎ করে কৃষি ব্যাংক এ সব চাষীদেরকে ঋণ পরিশোধের জন্য নোটিশ দেয় এবং তাদের অনেকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট মামলা করে। ফলে অনেক চাষীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পারোয়ানা জারি ও তাদের সম্পত্তি ক্রোক করা হতে পারে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করছেন।

কাপ্তাই বাঁধের ফলে হ্রদ এলাকার চাষীরা এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্থ। তাদের চাষ বাসের জমি তলিয়ে গেছে পানির নীচে। শুধু মাত্র বাগান বাগিচার উপর নির্ভর করে মৌসুমী ফল-মূল বিক্রি করে কোন রকমে দিন যাপন করছে তারা। অথচ এসব গরীব চাষীদের সাথেই প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে হর্টিকালচার বোর্ড। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার পার্বত্য এলাকার চাষীরাও। সরকার বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চাষীদের ঋণ মওকুফের ঘোষণা দিলেও পার্বত্য এলাকার চাষীদের কোন ঋণ মওকুফ করা হয়নি। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ চাষীদের ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে ঘোষণা কার্যকর হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রামে। অথচ সাইক্লোন, ঘুর্ণিঝড়, বন্যার কারণে পার্বত্য এলাকার চাষীরা সবসময় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

পার্বত্য অঞ্চলের গরীব চাষীদের দুর্দশা লাঘব, হর্টিকালচার বোর্ডের প্রতারণার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ বাগান চাষীদের প্রতিকার ও কৃষি ব্যাংক কর্তৃক সার্টিফিকেট মামলা দিয়ে হয়রানি বন্ধের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন বাগান চাষীরা।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে সংখ্যালঘু

৪র্থ পাতার পর

সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের ব্যাপারে এদেশে অনেক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এগুলোর অবসান হওয়া উচিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেও একজন ছাত্রের পক্ষে দেশের অন্যান্য জাতিসত্তাগুলোর ব্যাপারে তেমন কিছু জানা হয়না। সত্যি বলতে কি, ভুল ধারণাই থাকে। এভাবে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারে না। সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহকে জাতীয় স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য, তাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে গুরুত্বের সাথে পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৪. **শিক্ষার স্তর:** প্রাইমারী, হাই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কি কি বিষয় থাকা উচিত তা জাতীয় শিক্ষানীতিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের তেমন বক্তব্য দেবার নেই।

শিক্ষা সংক্রান্ত আমাদের দাবী সমূহ:

১) প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সকল জাতিসত্তাসমূহকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা নীতি প্রবর্তন করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। ২) ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভূক্ত থাকা প্রয়োজন। ৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যেকটি থানা সদরে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জেলা সদরে তিনটি কলেজকে অনার্স কোর্স সহ বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৪) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫% কোটা সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জন্য বরাদ্দ দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রয়োজন।

৫) সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহে চাকুরীর ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ কোটা বরাদ্দ দিতে হবে।

৬) পার্বত্য চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুল-ছাত্রাবাস সমূহ পুনরায় চালু করতে হবে এবং প্রয়োজন মতো স্কুল ও কলেজ ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭) প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি বন্ধ করতে হবে এবং স্কুল ও কলেজের শূন্য পদ সমূহে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। ❑

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে জাতিসত্তাসমূহের সমাবেশ

সকল জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবি

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ৬টি সংগঠন (পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সংগঠন, উরাঁও ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল, সান্তাল ছাত্র ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরাম) সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে ১৯ ফেব্রুয়ারী যৌথভাবে ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি জাতীয় প্রেস ক্লাব, শাহবাগ ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। এর পর সেখানে বাগাছাস এর মহানগর শাখার সভাপতি উজ্জ্বল আজিমের সভাপতিত্বে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা, জাতিসত্তার প্রতিনিধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, '৫২ সালে ভাষার জন্য আন্দোলন হয়েছে। আজ সে আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু যে দেশে ভাষার জন্য জীবন দিতে হয়েছে, সে দেশে অন্যান্য ভাষা সমূহের কোন স্বীকৃতি নেই। যে জাতি নিজের ভাষার জন্য লড়াই করেছে, ক্ষমতা পাওয়ার পর সে জাতির শাসক গোষ্ঠি অন্য জাতির ভাষার কোন মর্যদা দেয়নি। এটা জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। দেশে ৪০টিরও বেশী জাতিসত্তার বাস হলেও তাদের কোন স্বীকৃতি নেই। মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ নেই। পাঠ্য পুস্তকে জাতিসত্তাসমূহকে বিকৃত ও বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করা হয়।

বক্তারা পাঠ্য পুস্তকের বিভ্রান্তিকর তথ্য বাতিলের দাবি জানিয়ে বলেন, জাতিসত্তাসমূহের প্রকৃত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। সকল জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অন্তত: প্রাইমারী লেভেল পর্যন্ত নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। সমাবেশে পিসিপি'র পক্ষ থেকে বলা হয়, সরকার ও জেএসএস যে আপোষ চুক্তি করেছে তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'উপজাতীয় অধ্যুষিত অঞ্চল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজাতি শব্দটি পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তাসমূহের জন্য অবমাননাকর। আদিবাসি শব্দটিও বাইরে থেকে চাপানো। এটা আমরা কখনো মেনে নিতে পারি না। এর দ্বারা ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হয়।

সমাবেশে অতিথি বক্তারা আয়োজকদের দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বলেন, ভাষা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের ভাষা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, কিন্তু দেশে জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে কখনো স্বীকার করা হয়নি। রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়নি। বক্তারা জাতিসত্তাসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের পাশাপাশি জাতিসত্তাসমূহের ভূমি অধিকারও নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, পিসিপি'র চম্পানন চাকমা, বাগাছাস এর সেবাস্তিন রেমা, বিএমএসসি'র সাংমাপ্রু জলি, সান্তাল ছাত্র ইউনিয়নের সুবোধ বাসেক, উরাঁও ছাত্র সংগঠনের দেবেন এক্কা ও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফোরামে উইলিয়াম ত্রিপুরা।

এছাড়া সংহতি রেখে বক্তব্য রাখেন এইচ ডব্লিউ এফ -এর কবিতা চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি জোনায়েদ সাকি, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হাসান তারিক সোহেল, বাংলাদেশ ছাত্র লীগ (বাসদ)-এর ঈমাম গাজ্জালী, ছাত্র ঐক্য ফোরামের জিয়াউল হক, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর এমদাদুল হক, বিপ্লবী ছাত্র মঞ্চের রায়হান জামিল এবং যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ মঞ্চের সাইদিয়া গুলরুখ।

সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক মেঘনা গুহঠাকুরতা, মেজবা কামাল, বুয়েটের শিক্ষক হাসিবুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আনু মুহাম্মদ, গারো জাতিসত্তার সঞ্জীব দ্রং, মনিপুরী জাতিসত্তার মাথাই থুদু প্রমুখ।

সমাবেশ পরিচালনা করেন মিঠুন চাকমা। ❑

তথাকথিত শান্তিচুক্তির ফলাফল

সত্যভাষী

তথাকথিত 'শান্তিচুক্তি' সম্পাদন করার পেছনে আওয়ামী লীগ সরকারের কোন লক্ষ্য কাজ করেছে তা কাগজে কলমে লিখিত আকারে জানা না গেলেও এ চুক্তি দু'বছর পেরিয়ে যাবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, এ চুক্তিটা আসলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সামরিক-বেসামরিক সরকারগুলোর প্রণীত 'ভাগ কর, শাসন কর ও ধ্বংস কর' নীতিরই নবায়ন। এ 'পুরাতন বোতলে নতুন মদ' হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান অবস্থা ও সংঘটিত ঘটনাবলীর দিকে একটু গভীরভাবে মনোযোগ দিলেই এ সত্য সবার কাছে পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠবে। অবশ্য এ সত্যটা সম্পর্কে তখন সাধারণ জনগণ ভালভাবে ঠাহর করতে না পারলেও যারা রাজনীতির উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্কে কম বেশী জানে তারা পরিষ্কারভাবে আভাস পেয়েছিলেন। সে কারণে চুক্তির অব্যবহিত আগে ও পরে নিজেদের হীনস্বার্থ হাসিলের মোহে অন্ধ হয়ে অপরিণামদর্শী জনসংহতি সমিতির অধ:পতিত নেতৃত্ব গোষ্ঠীটা খুশীতে বিভোর হয়ে তথাকথিত শান্তি চুক্তির জোয়ারে ভেসে গেলেও পিজিপি, পিসিপি ও এইচ ডব্লিউ এফ-এর রাজনৈতিক কর্মি ও সচেতন জনগণ তথাকথিত শান্তিচুক্তিকে ধিক্কার জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যেটাকে তারা আখ্যায়িত করেছিলেন 'আপোষচুক্তি' হিসেবে। তারা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তথাকথিত শান্তিচুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। এ চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে এক জঘন্য 'আপোষ নামা' হিসেবে লেখা থাকবে। চুক্তির দু'বছর পর এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এ চুক্তি তাদের জন্য কি মারাত্মক পরিণতি বয়ে নিয়ে এসেছে।

১০ ফেব্রুয়ারী'১৯৯৮ খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে হাজার হাজার দর্শকের সামনে জনসংহতি সমিতি ও তাদের সশস্ত্র ক্যাডার শান্তিবাহিনী সদস্যদের আত্মসমর্পণ করিয়ে কি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন" বাস্তবায়ন করলেন! "বঙ্গবন্ধুর" স্বপ্ন কি ছিল? তিনি চেয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাদের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে দিয়ে তাদেরকে বাঙ্গালীত্বে উন্নীত করা। সেই স্বপ্নের কথা শেখ মুজিবুর রহমান প্রকাশ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে ধমকের সুরে বলেছিলেন- পার্বত্য চট্টগ্রামে লাখ লাখ বহিরাগত বাঙ্গালী ঢুকিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সমূহের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত করে দেবে। অথচ তিনি দীর্ঘ দুই যুগ পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর তীব্র জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে বাংলাদেরশের স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। অথচ সেই তিনিই নতুন রাষ্ট্র গঠনের পর অন্য জাতি সত্তার ওপর আক্রমণ চালান। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তিনি এক সামরিক অভ্যুত্থানে স্বপরিবারে নিহত হবার পর জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় আসেন। তিনি ক্ষমতায় এসে শেখ মুজিবের স্বপ্ন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করলেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লাখ লাখ বহিরাগত বাঙ্গালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুর্নবাসন করলেন। তাঁর এ অশুভ কাজে যাতে কেউ বাধা দিতে না পারে সেজন্য পুরো পার্বত্যাঞ্চলকে সামরিক বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ করে রাখলেন, অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে পার্বত্যবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে একদিকে বাঙ্গালী পুর্ণবাসন অন্যদিকে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য " ট্রাইব্যাল কনভেনশন" ও ভেতরে ভেতরে সামরিকায়ন শুরু করলেন। উদ্দেশ্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা এবং সেই ফাঁকে বাঙ্গালী পুর্ণবাসনের কাজকে দ্রুত এগিয়ে নেয়া। জেনারেল জিয়া এক সামরিক ক্যু দেতার মাধ্যমে নিহত হবার কয়েক মাস পরে তৎকালীন সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। তিনি ক্ষমতায় আসার পর জেনারেল জিয়ার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেন। আন্দোলন দমনের নামে অত্যাচার-নিপীড়নও বৃদ্ধি করলেন। হাজার হাজার জুম্ম জনগণের ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে দেয়া হল। ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হল পঞ্চাশ হাজারর অধিক জুম্ম নর-নারী। অন্যদিকে আন্দোলন-সংগ্রামও তুঙ্গে ওঠে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য দেশে-বিদেশে জনমত গড়ে ওঠে। বাঙ্গালী পুর্নবাসন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দেশ-বিদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে দেশ-বিদেশের জনমতকে ধোঁকা দেবার জন্য এবং আন্দোলনকে বাধাগ্রস্থ করার জন্য তথাকথিত 'জেলা পরিষদ' আইন জোর পূর্বক চাপিয়ে দিলেন। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তা প্রত্যাখান করে। ১৯৯০ সালের ছাত্র-গণ আন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলে দেশে প্রথমবারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় আসেন। তিনি জনসংহতি সমিতির সাথে নামমাত্র আলোচনা চালিয়ে কালক্ষেপন করলেন এবং শেখ মুজিব-জিয়া-এরশাদের গৃহীত নীতি অনুসরণ করে গেলেন। কোন সমাধান ছাড়াই তাঁর সরকারের মেয়াদ পার করিয়ে দিলেন খালেদা জিয়া। এরপর ১৯৯৬ সালের ১২ই জুন নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন অর্জন করে ক্ষমতাসীন হলেন। তিনিও মুজিব-জিয়া-এরশাদ-খালেদা সরকারের গৃহীত নীতির বাইরে কিছু করতে রাজী হলেন না। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা চালিয়ে যখন তাঁর সরকার বুঝতে পারল অধঃপতিত সন্তু লারমার পায়ের নীচে মাটি নেই তখন তিনি এক অভিনব জাদুকরী-ভেলকি দিয়েই ধরাশায়ী করলেন অধঃপতিত সন্তু ও তার পদলেহী গোষ্ঠীটাকে। গোপনে লোভ দেখিয়ে ও টোপ দিয়ে শান্তির অমোঘ বাণী শুনিয়ে সন্তু ও তার পদলেহী গোষ্ঠীটাকে কাবু করতে সক্ষম হলেন। তিনি 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের সকল প্রক্রিয়া অটুট রেখে শুধুমাত্র শান্তির বুলি আওড়িয়ে জনসংহতি সমিতিকে "শান্তিচুক্তি" নামক টোপ দিয়ে ধরে ফেললেন। শুধু কি তাই? তিনি ঐ শান্তিচুক্তির ঘুম পাড়ানি গান শুনিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের কাছে সরকারের পক্ষে ক্ষতিকারক যা বিষ ছিল সেটাও কেড়ে নিতে সক্ষম হলেন। এখন সরকার সাপুড়ে যেভাবে সাপের খেলা দেখায় জনসংহতি সমিতিকে দিয়ে তাই করছে । মুজিব-জিয়া-এরশাদ-খালেদা সরকারের গৃহীত নীতি অটুট রেখে নাম মাত্র একটা চুক্তি করে এবং কিছু উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে দিয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্ব গোষ্ঠীটাকে পোষ মানাতে পেরে শেখ হাসিনা মহাখুশী। শুধু খুশী নয় তিনি শান্তির ঢাকঢোল বাজিয়ে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার ও বহু ডিগ্রী কামাই করেছেন। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ পুরস্কার হিসেবে পাচ্ছে মৃত্যু, অপহরণ, হানাহানি, মারামারি, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও চরম অনিরাপত্তা। বর্তমানে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, চুক্তির পক্ষে না বিপক্ষে? বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়ও এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটা আওয়ামী লীগ সরকারের নতুন কৌশল, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্দোলনকামী জনগণকে বিভ্রান্ত করে বিভক্ত করা। পূর্বের সামরিক সরকারগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহকে বিভক্ত করে রাখার জন্য এক জাতিসত্তার বিরুদ্ধে অপর জাতিসত্তাকে ব্যবহার করতো। এভাবে বিভাজনের বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে জাতিসত্তাসমূহের যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান ঐক্য-সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে 'ভাগ কর, শাসন কর ও ধ্বংস কর' নামক জঘন্য-ঘৃণ্য নীতি চালিয়েছিল। এখন সেগুলো সেকেলে হয়ে যাওয়ায় আগের মত কার্যকরী হচ্ছে না তবে একেবারে অকেজো হয়ে যায়নি। আওয়ামী লীগ সরকার পূর্বের সামরিক-বেসামরিক সরকার গুলোর চেয়ে সুচতুর হওয়ায় পুরোনো নীতির আধুনিকায়ন করে তথাকথিত শান্তিচুক্তি নামক নতুন ফাঁদ পেতেছে। এ ফাঁদে পা দিয়েছে অধঃপতিত সন্তু ও তার পদলেহী গোষ্ঠিটা। এ চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনকামী জনগণকে বিভক্ত করার অভিনব কৌশল মাত্র। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে উৎসাহী দেশী-বিদেশী শান্তিকামী মানুষকে দেখাতে চেষ্টা করছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে 'উপজাতীরা' নিজের নিজেরা মারামারি ও হানাহানি করছে। এটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। পূর্বের সামরিক সরকারগুলো যেমন করে বলত 'উপজাতিরা' নিজেরা নিজেরা মারামারি-হানাহানি করছে। সেনাবাহিনী সে সব ঠেকানের জন্যই কাজ করে যাচ্ছে! বর্তমান সরকারের মূল উদ্দেশ্য ও একই।

তথাকথিত শান্তিচুক্তির পর পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের খনিজ ও বনজ সম্পদের ওপর অবাধ পুটপাটের রাজত্ব কায়েম করার এক জঘন্য প্রক্রিয়া চলছে। তথাকথিত উন্নয়নের নামে সম্পদ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে ব্যাপক ভাবে জোরদার করা হয়েছে। বন উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ অবাধে লুটপাটের হিড়িক পড়েছে বর্তমানে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক বনায়নের নামে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এই টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তথাকথিত অর্থকরী বনায়নের নামে। এই বন সৃষ্টির ফলে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল-গ্যাস অবাধে লুটপাটের জন্য বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীদের হাতে ঐ এলাকাকে তুলে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। তথাকথিত উন্নয়নের দোহাই দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধে বিচরণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে এনজিওদেরকে। এদের অধিকাংশই ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দরিদ্র জনগণকে ঋণের জালে আটকে রাখতে চাইছে। কোন কোন এনজিও বিশেষ মহলের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করছে বলেও জানা গেছে। মোটকথা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি বর্তমানে এক জটিল আকার ধারণ করেছে। এটা পরিষ্কার যে, অতীতে জিয়-এরশাদ যেমন ট্রাইবাল কনভেনশন ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জল ঘোলা করে হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন, বর্তমানে শেখ হাসিনার সরকারও জনগণের মৌলিক দাবিসমূহ পূরণ ব্যতীত পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন করে একই উদ্দেশ্য করতে চাইছে। অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে ফেলার যে প্রক্রিয়া শেখ মুজিবুর রহমান শুরু করেছিলেন সেই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বাস্তবায়নের ব্লুপ্রিন্ট ছাড়া পার্বত্য চুক্তি আর কিছুই নয়। ❑

ঈশ্বর তাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে দিন, তারা জানে না যে শয়তানের খপ্পড়ে পড়েছে

১ম পাতার পর

পরিণত হয়েছে।

চুক্তি সম্পাদনের পরে পরেই তারা হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়। যারা ভবিষ্যৎতে আন্দোলন জোরদার করতে পারে এমন সম্ভাবনাময়ী উদীয়মান নেতা-কর্মিদের খুন করতে তারা 'হিট লিষ্ট' প্রনয়ণ করে। সে অনুসারে 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদনের পাঁচ মাস অতিক্রান্ত না হতেই '৯৮ সালের ৪ এপ্রিল পানছড়িতে উদীয়মান যুবনেতা কুসুম প্রিয় চাকমা বিপুল ভোটে ইউপি চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হবার কয়েকদিনের মাথায় অপর এক উদীয়মান যুব নেতা পাহাড়ী গণ পরিষদের থানা সভাপতি প্রদীপ লাল চাকমা সহ প্রকাশ্য দিবালোকে শান্তিবাহিনীর সন্ত্রাসীদের হাতে অত্যন্ত নৃশংসভাবে প্রাণ হারান। তারপর পরই খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে চাকুরীজীবীদের সাথে বৈঠককালে সন্তু লারমা নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠে ঘোষণা দেন 'চুক্তি বিরোধীদের হরিণ-শুকরের মতো তাড়া করে মেরে ফেলা হবে। তাদের ধ্বংস করতে সেনা-পুলিশ-মুখোশ-দালাল সবার সাথে আঁতাত করা হবে।' কুসুম প্রিয় ও প্রদীপ লাল-এর হত্যাকারীরা তখন সার্কিট হাউজেই নিরাপদে আশ্রয়ে ছিলো। বাইরের গেইটে ছিলো কড়া পুলিশ প্রহরা। সেনা-পুলিশ প্রহরায় চিহ্নিত খুনীরা সার্কিট হাউজ -রেষ্ট হাউজে জামাই আদরে দিন কাটাতে থাকে। সরকারী সেবাযত্নের প্রতিদান জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীরা বিশ্বস্ততার সাথে দিতে থাকে। নির্যাতিত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লাড়াইয়ে নিবেদিত সম্ভাবনাময়ী নেতা কর্মিরা 'হিট লিষ্ট' অনুসারে একে একে খুন হতে থাকে। মাইচছড়ির হরেন্দ্র-হরুক্ষ্যা, দিঘীনালার আনন্দ-মৃণাল, সরোজ কার্ব্বারী, কাচালং এর স্কুল শিক্ষক বীর লাল, মানিক ছড়িতে পিসিপি নেতা মংসাই মারমার মতো সম্ভাবনাময়ী নেতাকর্মিরা জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীদের হাতে বিনাউস্কানীতে মারা পড়তে থাকে। '৯৯ এর ২২ এপ্রিল পুলিশ প্রশাসনের আঁতাত করে সুরমনি-প্রতুলকে তারা হত্যা করায়। ২২ অক্টোবর দিঘীনালা ঘটনার প্রতিবাদ সভায় সেনাবাহিনীর অপকর্ম আড়াল করার জন্য তারা ইউপিডিএফ'এর সমাবেশ ভন্ডুল করে দেয়।

দিঘীনালায় সাংগঠনিক সফরে গিয়ে জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীদের অতর্কিতে হামলায় ৮ ফেব্রুয়ারী নির্মম ভাবে খুন হয় ইউপিডিএফ'এর উদীয়মান সম্ভাবনাময়ী এক নেতা দেবোত্তম চাকমা। সর্বসাম্প্রতিককালে ৮ মার্চ তাদের হাতে মারা পড়েছে পানছড়ি তারাবন্যায় ইউপিডিএফ'এর কর্মি কালাইয়া ও তারা কুমার। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ইউপিডিএফ'এর কর্মি চাথোয়াই প্রু(২৪) কাউখালীর বর্মাছড়ি বাজারে যাবার পথে জনসংহতি সমিতির সন্ত্রাসীদের চোরাগোপ্তা হামলায় প্রাণ হারান।

ইউপিডিএফ জানে যে ক্ষমতাসীন সরকার পাহাড়ী জনগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লাগিয়ে দিয়ে আন্দোলন দমিয়ে রাখতে চায়। জনগণের দাবি পূরণ না করে ছলে-বলে-কৌশলে শাসন-শোষণ-নিপীড়ন চালিয়ে যেতে চায়। সে কারণে ইউপিডিএফ জনসংহতি সমিতির শত উস্কানী, হামলা, খুন-খারাপি, আপন সহযোদ্ধা হারানোর পরেও বৃহত্তর স্বার্থ প্রাধান্য দিয়ে বরাবরই ঐক্য-সংহতির ডাক দেয়। জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ন্যুনতম কর্মসূচির ভিত্তিতে জনসংহতি সমিতির সাথে সমঝোতার প্রস্তাব দেয় এবং সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

অবশেষে, ২০ ফেব্রুয়ারী জনসংহতি সমিতির সাথে ইউপিডিএফ'এর প্রথম বারের মতো আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, লিখিত সমঝোতা হয়। তার সাক্ষী হিসেবে থাকেন প্রাক্তন এমপি উপেন বাবুও। লিখিত সমঝোতা কোন পক্ষেরই প্রচার করার কথা ছিলো না। কোন ভুল বুঝাবুঝি হলে মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে ফয়সালা করা হবে বলে ঠিক হয়। অথচ সমঝোতার একদিন পরেই জনসংহতি সমিতি বেতছড়ির গ্রামীন কোন্দলে নিহত এক ব্যক্তির মৃত্যুকে পুঁজি করে তাৎক্ষনাৎ খাগড়াছড়ি সদরে মিছিল করে। মধ্যস্থতাকারীদের সাথে কোন রকম যোগাযোগ ছাড়াই একতরফাভাবে ইউপিডিএফ'কে হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী করে। যে সমঝোতা কোথাও প্রচার করার কথা ছিলো না, তা তারা পত্রিকায় ফলাও প্রচার করে ইউপিডিএফ'কে দোষী সাব্যস্ত করার সমস্ত রকম চক্রান্ত চালায়। স্বভাবতই এ ঘটনার মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতি দু'টি ধারা স্পষ্ট হয়ে পড়ে, যার একটি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আত্মঘাতি সংঘাত পরিহার করে 'সমঝোতা' চায়। তাই মত-পথের পার্থক্য সত্ত্বেও সমঝোতা হতে পেরেছে। জনসংহতি সমিতির আরেকটি অংশ সমঝোতা ভাঙতে উছিলা খুঁজতে থাকে। বেতছড়ির গ্রাম্য কোন্দলে মৃত্যু ঘটনাটিকে তারা মওকা হিসেবে পেয়ে যায়।

আন্দোলনকারী শক্তিসমূহের এক ও ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা সরকারের সবচেয়ে বড় আতঙ্কের কারণ। 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংসের' পলিশি আর কার্যকর করা না গেলে আর জনতাকে দমিয়ে রাখা যাবে না। জনগণের আন্দোলন জোরদার হলে আঞ্চলিক পরিষদের 'বড়শি গিলে ফেলা' অংশটির স্বার্থে টান পড়বে। সরকারের কাছে তত গুরুত্ব ও সুযোগ সুবিধা পাবে না- এই আশঙ্কায় 'সমঝোতা' তাদের জন্যও বিরাট আতঙ্কের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। জুম্মোদের মধ্যে ভ্রাতিঘাতি সংঘাত লাগিয়ে নামতে পারলেই সরকারের লাভ। বর্তমান সরকারের পলিশি হচ্ছে এটাই। সেনাবাহিনী-বিডিআর দিয়ে দমন-পীড়ন পর্ব শেষ। বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়ে জায়গা জমি বেদখল করে নেবার পর্বটিও শেষ হয়েছে। এখন সর্বশেষ অস্ত্রটি হচ্ছে 'জুম্মো দিয়ে জুম্মো ধ্বংস' করা। জনসংহতি সমিতি'র মধ্যে একটি গোষ্ঠি যে সরকারের এই জুম্মো ধ্বংসের ভায়বহ নীতিকে বাস্তবায়ন করে দিচ্ছে এটা দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

জনসংহতি সমিতির এই অংশটির কাছে জনগণের স্বার্থ হচ্ছে গৌণ-তুচ্ছ। নিজেদের স্বার্থ-ক্ষমতালাভই হচ্ছে প্রধান। সে কারণে 'পার্বত্য চুক্তিতে' জনগণের অধিকার জলাঞ্জলি গেলেও তারা আন্দোলনে নামতে চায় না। সরকারের নীল নক্সা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই তারা টিকে থাকতে চায়।

এই গোষ্ঠিটি হচ্ছে 'শয়তানের' মতো । এদেরই খপ্পড়ে পড়ে জনসংহতি সমিতির সাধারণ সদস্যরা নিজেদের অজান্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ক্ষতিসাধন করে চলেছে। তারা জানে না যে কাদের খপ্পড়ে পড়ে জনগণকে সর্বশান্ত করছে। সরকারের ফাঁদে পড়া গোষ্ঠিটির সাথে তাদের স্বার্থ এক নয়। তাদেরকে সমাজেই থাকতে হবে। আর সেই সমাজ-জাতির সর্বনাশ করে চলেছে ঐ গোষ্ঠিটি। শান্তিবাহিনীর সাধারণ সদস্যদেরকে গভীর ভাবে একথাটি বুঝতে হবে।

ইউপিডিএফ পার্বত্য চট্টগ্রামে আর কোন সংঘাত চায় না। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইউপিডিএফ সরকারের সমস্ত রকমের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে বৃহত্তর ঐক্যের ডাক দিয়েছে। সরকারের ফাঁদে পড়া জনসংহতি সমিতির সম্বিৎ ফিরে আসুক, শুভ বুদ্ধির উদয় হোক। জাতির কাছে তাদের অপরাধের মাত্রা না বাড়িয়ে সরকারের খপ্পড় হতে বেরিয়ে আসার জন্য ইউপিডিএফ আহ্বান জানাচ্ছে। যারা জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সামিল হতে ইচ্ছুক ইউপিডিএফ তাদের স্বাগত জানাবে। ❑

স্বাধিকার ॥ বুলেটিন নং ১৪ ॥ বর্ষ ৬ ॥ সংখ্যা ২

ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফর

স্বাধিকার প্রতিবেদন॥ দেশের প্রগতিশীল বাম রাজনৈতিক দল ও ছাত্র-গণ সংগঠনগুলির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে ২০ মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন ১২ ঘন্টার এক সংক্ষিপ্ত সফরে বাংলাদেশে আসেন। পুলিশ মিছিল ও সমাবেশে বার বার হামলা চালালেও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। ইউপিডিএফ সহ সকল প্রগতিশীল ও বাম দলগুলো এ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করেন।

ক্লিনটনের সফরের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ১৪ মার্চ সকল প্রগতিশীল ও বামদল গুলির যুগপৎ পল্টন ময়দানে সমাবেশ ও গণ মিছিল, ২০ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ ও গণ মিছিল। ১৪ মার্চ বিকাল ৪টায় প্রত্যেক সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলি পল্টন ময়দানে সমবেত হয় ও গণ মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব ছিলেন ইউপিডিএফ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, বিপ্লবী ঐক্য ফ্রন্ট ও জাতীয় গণ ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। মিছিলটি পল্টন ময়দান থেকে শুরু হয়ে পুরানা পল্টন মোড়, কাকরাইল মোড়, শান্তিনগর মোড়, মৌচাক, বড় মগ বাজার মোড়, বেইলি রোড, মৎস্য ভবন, জাতীয় প্রেসক্লাব ঘুরে মুক্তাঙ্গনে এসে শেষ হয়। মিছিলের বিক্ষুব্ধ কর্মিরা মার্কিন পতাকা পুড়িয়ে ফেলে। এ সময় পুলিশ বিনা উস্কানীতে মিছিলের উপর হামলা চালায়। এতে অনেক কর্মি আহত হন। আহতরা হলেন তসলিমা আখতার, ফারজানা, মাসুদ, ইব্রাহিম, বিধু, রাসেল বড়ুয়া।

এরপর সফরের দিন অর্থাৎ ২০ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও গণ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গণ মিছিলের পূর্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ, জাতীয় গণ ফ্রন্ট, বিপ্লবী ঐক্য ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, বাম ফ্রন্ট, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিলটি নাজিম উদ্দিন রোড, কেন্দ্রীয় কারাগার, বংশাল রোড, ইংলিশ রোড ঘুরে পুরানা ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে এসে শেষ হয়। মিছিলটি শেষ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পুলিশ মিছিলের উপর বেপোরোয়া লাঠি চার্জ করে। এতে সাংবাদিকসহ অনেকে আহত হন।

ক্লিনটনের সফরের প্রতিবাদে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ১২টি ছাত্র সংগঠনের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের সফরের প্রতিবাদে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ১২টি ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১ মার্চ মুধর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ ছাত্র জোট আত্মপ্রকাশ করে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদসহ সকল জাতীয় ছাত্র সংগঠন এ ছাত্র জোটে অন্তভুক্ত হয়। ক্লিনটনের সফরের প্রতিবাদে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ১২টি ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে। এ সমাবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, প্রাক্তন ছাত্র নেতৃবৃন্দ ১২টি ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। ৯ মার্চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিমুখে পদযাত্রা কালে পুলিশ হাইকোর্ট মাজারের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলটি থামিয়ে দেয়। ১২ মার্চ মার্কিন দূতাবাস অভিমুখে পদযাত্রার সময় শাহবাগ মোড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলটি থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ছাত্ররা এগিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ বেপেড়োয়া লাঠিচার্জ করে। পরে ছাত্ররা সেখানে ক্লিনটনের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। পুলিশের হামলায় ছাত্র ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সবুজ ও বিপ্লবী ছাত্র সংঘের আহ্বায়ক পিংকী সহ অনেকেই আহত হন।

শহীদ অমর বিকাশের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ ৭ মার্চ খাগড়াছড়িতে শহীদ অমর বিকাশের ৪র্থ মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়। সকাল ৮ টায় পিসিপি, এইচ ডব্লিউ এফ, চান্দবী ক্লাব ও শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে শহীদ অমর বিকাশ স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। বিকালে উত্তর খবংপুজ্যায় পিসিপি জেলা শাখার সহসভাপতি জেলাস চাকমার সভাপতিত্ব এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্মরণ সভায় বক্তারা বলেন, একমাত্র পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শহীদদের আত্মত্যাগের প্রকৃত মর্যাদা দেয়া সম্ভব। শহীদ অমর বিকাশ চাকমা সহ সকল শহীদদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃপ্ত শপথ নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। সভায় বক্তব্য রাখেন সোনালী চাকমা, অন্তরিকা চাকমা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ৭ মার্চ সেনাবাহিনীর মদদপুষ্ট মুখোশ বাহিনীর হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে অমর বিকাশ চাকমা শহীদ হন।

বাবুছড়া বাজার বয়কট নিয়ে জেএসএস এর ষড়যন্ত্র

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ বাবুছড়া বাজার বয়কট নিয়ে জনসংহতি সমিতি এখন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে এলাকার জনগণ যেন তাদের দাবি জলাঞ্জলি দিয়ে বাজার বয়কট কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়। এজন্য জেএসএস'র ভূমিকা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠছে। গত ২৯ ফেব্রুয়ারী জেএসএস স্থানীয় বেনুবন বিহারে (সেনারা ঘটনার দিন এ বিহারে গিয়ে ভিক্ষুদেরকেও মারধর করেছিল) সমঝোতা বৈঠকের নাম দিয়ে একতরফাভবে বাজার বয়কট প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য জনগণের ওপর চাপ দেয়। কিন্তু জনগণ তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বয়কট অব্যাহত থাকবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। তথাকথিত সমঝোতা বৈঠকে জেএসএস-এর তাতেন্দ্র লাল চাকমা, ধীর কুমার চাকমা, ভারতেশ্বর চাকমা ও জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নেতা উপেন্দ্র লাল চাকমা উপস্থিত ছিলেন। যে সব দাবি জানিয়ে বাজার বয়কট অব্যাহত রয়েছে তার কিছুই এখনো পূরণ হয়নি। এ পরিস্থিতিতে জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে ওস্তাদ জেএসএস বাবুছড়ার জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও বাজার বয়কট কর্মসূচী ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ অক্টোবর'১৯৯৯ বাবুছড়া বাজারে হাটের দিন জনৈক সেনা সদস্য এক পাহাড়ী কিশোরীর শ্লীলতাহানীর চেষ্টা চালালে বাজারে উপস্থিত লোকজন তার প্রতিবাদ করে। এরপর এক পর্যায়ে সেনারা সেটেলারদের সাথে নিয়ে পাহাড়ীদের উপর হামলা চালালে এতে চার জনের মৃত্যু হয়। সেই পর থেকে ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সহ বিভিন্ন দাবিতে লোকজন বাবুছড়া বাজার বয়কট অব্যাহত রেখেছেন।

বাবুছড়া বাজার খুলে দিতে মেজরের তৎপরতা

বাবুছড়া ক্যাম্পের কমান্ডার মেজর আলম (১২ ই:বে:) বাবুছড়া বাজার বয়কট প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য পাহাড়ীদের উপর চাপ দিচ্ছে। তার আদেশ অমান্য করা হলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে বলেও সে লোকজনকে হুমকি দেয়। গত ২৭ জানুয়ারী উক্ত মেজর বাবুছড়া বাজারের বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত নোয়াপাড়া ও রাস্তা মাথায় দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দেয়। এতে এলাকার জনগণের ক্ষোভ আরো বেশী বেড়ে যায়। তারা এতদসত্বেও বাজার বয়কট অব্যাহত রাখেন। পরে দীঘিনালার টিএনও স্থানীয় জনসাধারণের কাছে একভাবে বোঝাপড়া করে আসেন এবং উক্ত মেজর কর্তৃক জোর করে বন্ধ করে দেয়া দোকানপাট খুলে দেন।

সংসদে জননিরাপত্তা আইন পাশ হওয়ায় পিসিপি'র বিক্ষোভ মিছিল

স্বাধিকার রিপোর্ট॥ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ গণবিরোধী জননিরাপত্তা আইন সংসদে পাশ হওয়ার প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারী ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি মুক্তাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে নূর হোসেন স্কোয়ার, পল্টন মোড় ও প্রেস ক্লাব ঘুরে টিএসসি'তে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক চম্পানন চাকমা ও ঢাকা শাখার সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা।

বক্তারা বলেন, গণবিরোধী এ কালো আইনটি সংসদে উত্থাপনের ১৫ মিনিটের মধ্যে পাশ করেছে সরকারী দল আওয়ামী লীগ। এ আইন জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি। সন্ত্রাস দমন নয়, এই আইন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকে সন্ত্রাস দমনের জন্য দেশের প্রচলিত আইনই যথেষ্টে। নতুন কোন আইনের প্রয়োজন নেই। নেতৃবৃন্দ জননিরাপত্তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সকল কালাকানুন বাতিলের দাবি জানান।

দু'দিনে মধ্যে চার পিসিপি কর্মিকে অপহরণ

স্বাধিকার প্রতিনিধি॥ পানছড়ি-খাগড়াছড়ি সড়কে দু'দিনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চার কর্মিকে অপহরণ করেছে দুই নাম্বারীরা।

অপহৃত কর্মিদের মধ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারী শ্যামল জ্যোতি চাকমাকে (১৭) [পিতা: রজত বরণ চাকমা গ্রাম: হেডম্যান পাড়া, পেরাছড়া, খাগড়াছড়ি] পানছড়ি কলেজ থেকে পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ ছেড়ে মা'র সাথে বেবী টেক্সীতে করে বাড়ী ফেরার পথে কুড়াদিয়া ছড়া নামক স্থান থেকে দুই নাম্বারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়।

একই দিনে রত্নকান্তি চাকমাকে (২০) [পিতা: রমনী রঞ্জন চাকমা, গ্রাম: রত্নমনি পাড়া, পানছড়ি] খাগড়াছড়ি থেকে বাড়ী ফেরার পথে পানছড়ি কলেজ গেট এলাকায় অবস্থিত জেএসএস অফিসের সামনে থেকে কতিপয় কতিপয় দুর্বৃত্ত অপহরণ করে নিয়ে যায়। সে হাটাজারী কলেজের বিএসসি কোর্সের ছাত্র। অপহরণকারীরা জেএসএস -এর সদস্য বলে জানা গেছে।

পরদিন লতিবান ইউনিয়নের নালকাটা এলাকা হতে ত্রিপময় চাকমা (২৫) পিতা: নীলমনি চাকমা গ্রাম: ১নং প্রকল্প যৌথ খামার, ও সমর জ্যোতি চাকমা (৩০) পিতা: সুধীধর চাকমা, গ্রাম: ১নং প্রকল্প যৌথ খামার- এ দু'জনকে জেএসএস কর্মি ও দুইনাম্বারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা নালকাটা গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

উক্ত অপহরণের বিরুদ্ধে জনমত সংঘটিত হলে দুর্বৃত্তরা পরে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

তিন ট্যাহরীতে ডাকাতি, এক মারমা মেয়ে ধর্ষণের শিকার

স্বাধিকার প্রতিবেদন ॥ গত ১৮ই মার্চ ২০০০, খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কে তিন ট্যাহরী নামক স্থানে এক ডাকাতি সংঘটিত হয়।

জানা যায়, ঐদিন মানিকছড়ির দাজ্যা গ্রামের চুনিউ মারমা পিতা অংফ মারমা ও ধুম্মা মারমা স্বামী আক্যশৈ মারমা এবং ডেবাতলী গ্রামের খিজাঅং মারমা তার স্ত্রী নিচামা মারমা ও অরেশে মারমা চিৎমরম বৌদ্ধবিহার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তারা তিন ট্যাহরীতে সেটেলারদের গুচ্ছগ্রামের সামান্য দক্ষিণ পূর্বে কুমারী রাস্তায় পৌঁছলে ডাকাতরা তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। সন্ত্রাসীরা চুনিউ মারমাকেও (১৩) ধরে নিয়ে যায় এবং ধর্ষণ করে। পরে ঘটনার খবর দ্রুত জানাজানি হয়ে গেলে ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

উক্ত ঘটনার সাথে জড়িতদের নাম জানা গেছে। এরা হলো ১. মোঃ আজিজ পিতা রহিম আলী গ্রাম তিন ট্যাহরী গুচ্ছগ্রাম ২. জামাল পিতা আব্দুল আলী, তিন ট্যাহরী গুচ্ছগ্রাম ৩. মোঃ এরশাদ পিতা আজিজ, তিন ট্যাহরী গুচ্ছগ্রাম ৪. মোঃ সিরাজুল পিতা আব্দুর রহমান লিডার ৫. মোঃ মোফাজ্জল পিতা খোরশেদ আলম ভূঁইয়া, তিন ট্যাহরী গুচ্ছগ্রাম ৬. মোঃ খোরশেদ পিতা আব্দুল হাকিম গ্রাম দেবপোয়া, মানিকছড়ি ৭. মোঃ জাহাঙ্গীর পিতা হরমোজ আলী, তিন ট্যাহরী গুচ্ছগ্রাম ৮. মোঃ শামসুল ইসলাম পিতা আবদুল করিম, তিন ট্যাহরী গুচ্ছগ্রাম ৯. মোঃ রফিক মিয়া, জাহাঙ্গীরের আত্মীয়, ঠিকানা জানা যায়নি ১০. মোঃ মিজান ঠিকানা অজ্ঞাত ১১. লাল বোর্ডের ড্রাইভার নামে পরিচিত জাহাঙ্গীরের বন্ধু।

জানা গেছে, এরা প্রায় সকলেই রাসেল স্মৃতি সংসদের সদস্য। সংঘবদ্ধ হয়ে এরা ঐ এলাকায় নিয়মিত ডাকাতি করে থাকে। পাহাড়ী কিংবা বাঙালী কেউ বাদ যায় না। ❑

জেএসএস সন্ত্রাসীদের হামলায় সম্ভাবনাময়ী তরুণ নেতা দেবোত্তম চাকমা নিহত

স্বাধিকার প্রতিবেদন ॥ ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর পানছড়ি ইউনিটের একনিষ্ট কর্মি লড়াই সংগ্রামের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়ী নেতা দেবোত্তম চাকমা গেল ৭ ফেব্রুয়ারী,২০০০ দীঘিনালার বাবুছড়া এলাকায় নুনছড়ির তপ-পদিমাছড়াতে জনসংযোগ সফরকালে সন্ত্রাসী ঘাতকদের হাতে নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। তার সাথে আহত হয়েছেন আরো কয়েকজন সহযোদ্ধা।

ঘটনার দিন সকাল সাতটা-আটটার দিকে তিনি দু'জন সহযোদ্ধা নিয়ে তপ-পদিমাছড়ায় পূর্ব নির্ধারিত মিটিঙে যোগ দিতে রওনা হন। মাঝ পথে সেনাবাহিনীর কায়দায় ওঁৎ পেতে থাকা গণদুশমন সন্ত্র চক্রের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দেবোত্তম ও তার সহযোদ্ধাদের লক্ষ্য করে বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়। ঘাতকের নির্মম বুলেট দেবোত্তমের কপালে বিদ্ধ হলে, সাথে সাথেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অপর দুই সহযোদ্ধা আহত অবস্থায় কোনক্রমে ঘাতকদের হিংস্র থাবার নাগাল হতে সরে যেতে সক্ষম হন। গুরুতরভাবে জখম দেবোত্তমের উপর ঘাতকরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'পয়েন্ট ২২ বোর রাইফেল' ঠেকিয়ে উন্মত্তভাবে বুকে-পেটে- মুখে গুলি চালায়। সব গুলিই দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তার মানি ব্যাগও খুনীরা ছিনিয়ে নেয়। সরকারের 'জুম্ম দিয়ে জুম্ম ধ্বংসের' নীল নক্সা সন্ত্রাসী ঘাতকরা বাস্তবায়ন করে। সরকারের এধরনের ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা ও জাতীয় বেঈমান বিশ্বাসঘাতকদের কাপুরুষোচিত আক্রমণ ও সীমাহীন বর্বরতার কাছে বলি হলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্যাতিত জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ অকুতোভয় নির্ভীক সৈনিক আগামীদিনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়ী এক নেতৃত্ব।

লেখিকা সেলিনা হোসেনের সাথে দেবোত্তম চাকমার কথোপকথন

বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের সাথে শহীদ দেবোত্তম চাকমার কথা হয়েছিল ধুধুকছড়ায়। তাদের কথাবার্তায় দেবোত্তম চাকমা আপোষ চুক্তি কেন তার পক্ষে মানা সম্ভব নয়, তার জবাব দিয়েছিলেন। সেলিনা হোসেন তাঁর "একটি উপন্যাসের সন্ধানে" গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় এই কথোপকথন লিপিবদ্ধ করেন এ ভাবে-

... ওখানে কথা হয় দেবোত্তম চাকমার সঙ্গে। বয়স উনত্রিশ বছর। ওর বাবার নাম রেবতী রঞ্জন চাকমা। স্থায়ী ঠিকানা-দুদুকছড়ি গ্রাম, লোগাং ইউনিয়ন, পানছড়ি থানা। দেবোত্তম চট্টগ্রামের গহিরা কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ করেছে। ও স্পষ্ট ভাষায় বললো, আমরা এই শান্তিচুক্তি মানি না।

-কেন বলুন?

- এক, যে চুক্তি করা হয়েছে তার কন্সটিটিউশনাল গ্যারান্টি নাই। দুই, সেনাবাহিনী উইথড্র করা হবে না। তিন, ছিন্নমূল বাঙালি সেট্‌লারদের পুনর্বাসন করছে। চার, ল্যান্ড রাইট মানছে না। পাঁচ, আমাদের পাহাড়ি না বলে উপজাতি বলা হয়েছে।

- কি করবেন এখন?

- নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করবো।

আগামী ২০শে মে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ১১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ১০ম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ কর্মসূচী সফল করতে সফল শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। -কেন্দ্রীয় কমিটি, পিসিপি

আমাদের অগনিত পাঠকদের সুবিধার্থে স্বাধিকারে আগামী সংখ্যা থেকে চিঠিপত্র বিভাগ খোলা হচ্ছে। যে কেউ যে কোন বিষয়ে লিখতে পারবেন। এছাড়া এবারের সংখ্যা থেকে মতামত বিভাগ তো থাকছেই। লেখার আমন্ত্রণ রইল। -সম্পাদক

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত। সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ৩৮৮ পূর্ব বাড়ী, জগন্নাথ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা